

প্রথম ভাগ

ইতিহাসের ধারা

ইতিহাসের ধারা

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কালকাতা-৯

সপ্তম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

মূল্য : ১০ টাকা

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত ॥

সূচীপত্র

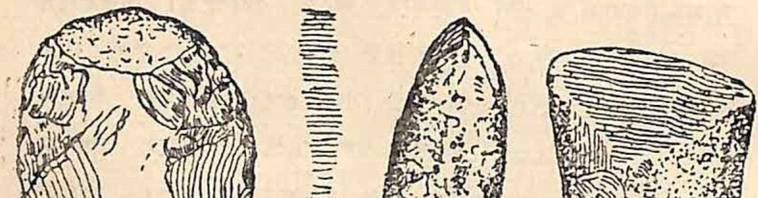
ভারতের আদিবাসী

গোড়ার কথা

ভারত অতি পুরাতন দেশ। কালে কালে এ দেশের সীমানা বদলেছে, রূপ বদলেছে, অবস্থা বদলেছে। এককালে আফগানদের দেশ কান্দাহার ছিল ভারতের মধ্যে। তখন তার নাম ছিল গান্ধার। এককালে সিন্ধু প্রদেশের মরু অঞ্চলে সোনা ফলত। এখন যেখানে জল নেই, এককালে সেখানে প্রচুর বৃষ্টি হত—জায়গাটা ছিল গাছপালায় সবুজ। কালে কালে কত নদী গতিপথ বদলেছে; আর সে সব নদীর জলের উপর মানুষের চাষবাস নির্ভর করত বলে, নদীর ধারে যারা থাকত তাদের ভাগ্যও বদলেছে। এইভাবে কত গ্রাম, কত শহর গড়ে উঠেছে—আবার লোপ পেয়েছে। এমনি কত যে অবস্থার হেরফেরের মধ্যে দিয়ে এসেছে আমাদের এই দেশ—তার কতটুকুই বা আমরা জানি!

আমাদের এই দেশের মাত্র হাজার-ছয়েক বৎসরের ইতিহাস আমাদের জানা আছে। এই ছয় হাজার বৎসরেরও আগে এদেশের মানুষ কেমন ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। তবে সে সময়কার মানুষ যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করত; সেগুলো দেখে তাদের সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করতে

পারি। তাদের পাথরের বঁড়শি দেখে বুঝি, তারা মাছ ধরত; পাথরের বর্শা দেখে বুঝি, তারা শিকার করত; পাথরের সূচ দেখে বুঝি, সে-সূচ দিয়ে তারা গাছের বাকল সেলাই করত, পশুর চামড়া সেলাই করত। ঐ বাকল আর চামড়া দিয়ে তারা কাপড়ের কাজ চালাত। পাহাড়ের গুহায় তাদের পাথুরে অস্ত্র পাওয়া গেলে আমরা বুঝি, অন্য ঋতুতে না হোক, অন্ততঃ শীতকালটা তারা গুহায় বাস করত।



প্রাচীন পাথরের যুগের অস্ত্র নূতন পাথরের যুগের অস্ত্র

আগেকার মানুষের এইসব পাথুরে অস্ত্রপাতি আমরা পাই মাটির নীচে থেকে। দক্ষিণ আর মধ্য ভারতের নদীর ধারে ও পাহাড় অঞ্চলে অনেক পাথুরে অস্ত্রপাতি পাওয়া গেছে।

কিছু দিন আগে পশ্চিম বাংলার দুর্গাপুরে সেই আদিকালের বাঙালীদের কতকগুলো অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল।

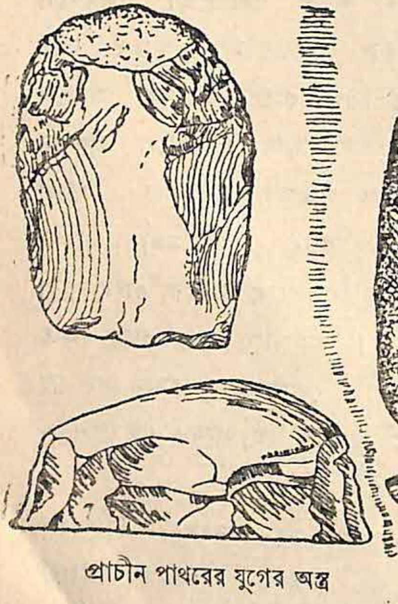
পাথুরে অস্ত্রপাতির সবগুলোই কিন্তু একই সময়ের নয়। হয়তো হাজার হাজার বৎসর ধরে একই রকমের অস্ত্রপাতির ব্যবহার চলে এসেছিল। অস্ত্রপাতির গড়ন, ধার আর চেহারা দেখে মোটামুটি বলা যায়, কোন্‌টা বেশী পুরানো, কোন্‌টা কম পুরানো ; কোন্‌টা আগেকার মানুষে ব্যবহার করেছে, কোনটা পরের মানুষে।

প্রস্তর বা পাথরের যুগেই ভারতের লোক মাটির বাসন তৈরি করতে শিখেছিল। সে বাসন তারা তৈরি করত হাত দিয়ে। কখনো কখনো সে বাসনে তারা রঙ ধরাত, নানা রকম আঁকজোখ কাটত। পাথুরে যুগের শেষ দিকে এ দেশের লোক তামার ব্যবহার শেখে। তবে তামার ব্যবহার তারা কমই করত। তামার মত সস্তা ধাতুও সে-যুগে খুব বেশী পাওয়া যেত না। ভারতের আদিম মানুষের সম্বন্ধে এর বেশী কিছু নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

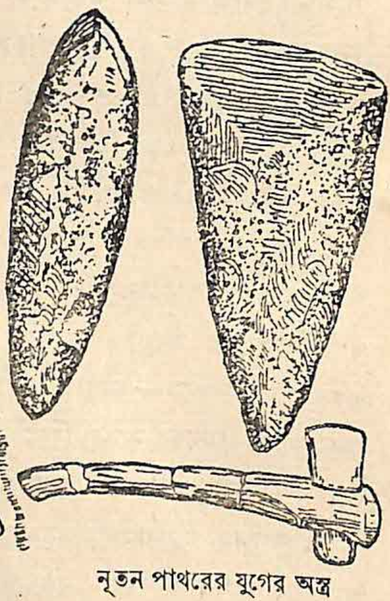
আদিবাসী কারা

যেসব জাতের মানুষ আজ থেকে অনেক হাজার বৎসর আগেও এ দেশে বাস করত, তাদের আমরা আদিবাসী বলি। আদিবাসীদের কেউ কেউ যে ভারতের বাইরে থেকে আসেনি, এ কথা জোর করে বলা যায় না। তবু কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি যেসব জাত এখনো এ দেশের পাহাড় জঙ্গলে

পারি। তাদের পাথরের বঁড়শি দেখে বুঝি, তারা মাছ ধরত; পাথরের বর্শা দেখে বুঝি, তারা শিকার করত; পাথরের স্তূচ দেখে বুঝি, সে-স্তূচ দিয়ে তারা গাছের বাকল সেলাই করত, পশুর চামড়া সেলাই করত। ঐ বাকল আর চামড়া দিয়ে তারা কাপড়ের কাজ চালাত। পাহাড়ের গুহায় তাদের পাথুরে অস্ত্র পাওয়া গেলে আমরা বুঝি, অন্য ঋতুতে না হোক, অন্ততঃ শীতকালটা তারা গুহায় বাস করত।



প্রাচীন পাথরের যুগের অস্ত্র



নূতন পাথরের যুগের অস্ত্র

আগেকার মানুষের এইসব পাথুরে অস্ত্রপাতি আমরা পাই মাটির নীচে থেকে। দক্ষিণ আর মধ্য ভারতের নদীর ধারে ও পাহাড় অঞ্চলে অনেক পাথুরে অস্ত্রপাতি পাওয়া গেছে।

কিছু দিন আগে পশ্চিম বাংলার দুর্গাপুরে সেই আদিকালের বাঙালীদের কতকগুলো অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল।

পাথুরে অস্ত্রপাতির সবগুলোই কিন্তু একই সময়ের নয়। হয়তো হাজার হাজার বৎসর ধরে একই রকমের অস্ত্রপাতির ব্যবহার চলে এসেছিল। অস্ত্রপাতির গড়ন, ধার আর চেহারা দেখে মোটামুটি বলা যায়, কোন্‌টা বেশী পুরানো, কোন্‌টা কম পুরানো ; কোন্‌টা আগেকার মানুষে ব্যবহার করেছে, কোনটা পরের মানুষে।

প্রস্তর বা পাথরের যুগেই ভারতের লোক মাটির বাসন তৈরি করতে শিখেছিল। সে বাসন তারা তৈরি করত হাত দিয়ে। কখনো কখনো সে বাসনে তারা রঙ ধরাত, নানা রকম আঁকজোখ কাটত। পাথুরে যুগের শেষ দিকে এ দেশের লোক তামার ব্যবহার শেখে। তবে তামার ব্যবহার তারা কমই করত। তামার মত সস্তা ধাতুও সে-যুগে খুব বেশী পাওয়া যেত না। ভারতের আদিম মানুষের সম্বন্ধে এর বেশী কিছু নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

আদিবাসী কারা

যেসব জাতের মানুষ আজ থেকে অনেক হাজার বৎসর আগেও এ দেশে বাস করত, তাদের আমরা আদিবাসী বলি। আদিবাসীদের কেউ কেউ যে ভারতের বাইরে থেকে আসেনি, এ কথা জোর করে বলা যায় না। তবু কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি যেসব জাত এখনো এ দেশের পাহাড় জঙ্গলে

বাস করে, তারাই যে, ভারতের সব চেয়ে পুরানো অধিবাসী, এ কথা বলা যায়। তাদের প্রায় সবাই এখনো বনের পশু-পাখি শিকার করে, মাছ ধরে বা সামান্য চাষবাস করে জীবন কাটায়। ভারতের এই আদিবাসীদের মোট সংখ্যা হবে প্রায় দুই কোটি।

তিন রকমের আদিবাসী—আদিবাসীরা ভারতের তিনটি এলাকা জুড়ে বাস করে। উত্তর-পূর্ব এলাকায়—অর্থাৎ হিমালয়ের পূর্ব দিকের ঢালুতে বাস করে সিকিমের 'লেপচারা' আসাম-ব্রহ্ম প্রান্তের 'কুকি' ও 'লুসাই'রা। এ এলাকায় নাগা, রাভা, খাসি, মিশমী প্রভৃতি উপজাতিরাও বাস করে। মাঝের এলাকায় অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্বত ও তার আশে পাশে, সব চেয়ে বেশী সংখ্যক আদিবাসীর বাস। সাঁওতাল, শবর, গোঁড়, খোঁড়, কোল, হো প্রভৃতি উপজাতির বাস এই মধ্য এলাকায়।

তৃতীয় অর্থাৎ দক্ষিণের এলাকা হচ্ছে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে। টোডা, কোটা, পালিয়ান, কাদার, পান্তারাম প্রভৃতি উপজাতি এই অঞ্চলের পাহাড়গুলোয় ছড়িয়ে আছে।

দেখতে শুনতে, ভাষায় আর শিক্ষাদীক্ষায় এই তিন অঞ্চলের আদিবাসীরা তিন রকমের।

দক্ষিণ এলাকা—একেবারে দক্ষিণের আদিবাসীরা ভারতের সব চেয়ে পুরানো লোক। এদের গায়ের রং ঘোর কালো, নাক চেপটা। এখন, এরা নিজেদের আদি ভাষা ভুলে গেছে। আগে এরা শিকার করত, আর বনে-জঙ্গলে ফলমূল ও মধু সংগ্রহ করে জীবনধারণ করত; চাষবাস মোটেই জানত না। এদের একমাত্র

হাতিয়ার ছিল খোন্তা ; তাই দিয়ে গাছের শিকড় খুঁড়ে খেত। তারধনুক গোছের কোন অস্ত্রও তাদের ছিল না। পাতা দিয়ে তারা লজ্জা নিবারণ করত ; কাপড়ের বালাই ছিল না। মায়ের নামে এদের ছিল পরিচয়। পুরুষের মত এদের মেয়েদেরও বহু বিবাহ হত।

মাঝের এলাকা—মধ্যের এলাকার আদিবাসীরা দেখতে কতকটা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মত। তাদের রং কালো। তারা মাথায় খাটো, আর তাদের নাকের গোড়াটা খুব নীচু হলেও ডগাটা নীচু নয়। তাদের ভাষা হচ্ছে মুণ্ডাদের ভাষার মত—সে ভাষায় ক্রিয়াপদ বলে কিছু নেই ; বিশেষ্য পদের কোন লিঙ্গও ঠিক নেই। দক্ষিণী আদিবাসীদের তুলনায় তাদের শিক্ষাদীক্ষা কিছু আছে। তারা চাষ করতে জানে, তবে এক জমিতেই বেশী দিন তারা চাষ করে না। তারা বাড়িঘর তৈরি করে বেশ মজবুত করে। বাঁশের কাজে ও কাঠ-খোদাই-এর কাজে তারা খুব দক্ষ। এসব কাজের জন্যে তারা নানা রকমের হাতিয়ার ব্যবহার করে। তারা নাচ-গানের খুব ভক্ত। সাঁওতালরা হচ্ছে এই মাঝের আদিবাসীদের মধ্যে সব চেয়ে উন্নত। মাঝের অঞ্চলের এই উপজাতিরা এখন কিছুটা সভ্য হয়েছে।

উত্তর-পুর্ব এলাকা—উত্তর-পূর্ব এলাকার আদিবাসীরা দেখতে কতকটা মোঙ্গলদের মত। তাদের রং ফর্সা, চুল আর চোখের তারা কালো। তাদের মুখ চেপটা, চোয়াল উঁচু। তাদের নাক বেশ লম্বা, তবে একটু খাঁদা। তারা যেসব ভাষায়



সাঁওতাল



মুণ্ডা



কোল



টোডা



খাসিয়া



লেপচা

কথা বলে, যেসব ভাষার সঙ্গে তিব্বতী ও বর্মী ভাষার অনেক মিল আছে। তাদের মধ্যেও মায়ের পরিচয়ে মানুষের পরিচয় দেওয়া হয়। তাদের সমাজে মেয়েদের মান-সম্মান পুরুষদের চেয়ে বেশী। এখানকার আদিবাসীদের এই এলাকার মধ্যেও আবার এলাকা আছে। বাইরের এলাকায় যারা থাকে, তাদের ধরন-ধারণ লড়ুইরের মত। বিশেষ করে আসামের নাগারা এখনো মানুষের মাথা কেটে এনে বাড়ি সাজায়। এরা চাষ করে, তবে সে চাষ অতি পুরানো ঢংয়ের। তারা নিজেদের কাপাস নিজেরা জন্মায়; তা দিয়ে চমৎকার কাপড় তৈরি করে। অনেক রকম হাতের কাজেও তারা দক্ষ। এ এলাকার আদিবাসীদের শরীর খুব শক্ত, স্বাস্থ্যও খুব চমৎকার। তারা নাচ-গান খুব ভালবাসে।

সর্বত্রই আদিবাসীরা বেশ সৎ আর সরল। সভ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে তারা যথেষ্ট ঠকেছে। তাদের ক্ষতি না করে, সভ্যতার পথে নিয়ে আসার ভার আজ পড়েছে স্বাধীন ভারতের উপর।

অনুশীলনী

১। ছ হজার বৎসরের আগে যারা এ দেশে বাস করত, তাদের খবর পাওয়া যায় কি করে? আদিবাসী কাদের বলে?

২। ভারতের আদিবাসী কারা? কয়েকটা আদিবাসী উপজাতির নাম বল।

৩। 'তিন এলাকার আদিবাসী তিন রকমের।'—এ কথা কি সত্য? এলাকাগুলোর নাম কর।

৪। কোন্ এলাকার আদিবাসী কেমন, সংক্ষেপে লেখ।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা

পৃথিবীর কোন দেশেই একেবারে আদিকালের মানুষ চাষ জানত না। তারা পশু-পাখি মেরে খেত ; বনের ফলমূল খেত। কালক্রমে মেয়েরা, মনে হয়, এমন দু-এক রকম ঘাসের বীজ পেল, যা খাওয়া যায়। নরম মাটিতে বীজ ফেললে যে নতুন ঘাস জন্মায়, আর সে নতুন ঘাসে অনেকগুলো বীজ ফলে, এটাও তারা দেখল। তারা এইভাবে এইসব ঘাসের চাষ শিখল। কালে কালে মানুষের যত্নে এই সব বীজই ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্য হয়েছে। এই হল চাষের জন্মকথা। শস্য ফলাতে শিখে মানুষের জীবন অনেক বদলে গেল। মানুষ নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে শিখল।

চাষ করতে শিখে মানুষ এক জায়গায় পাকাপাকি বাসা বাঁধতে শিখল, বাড়িঘর তৈরি করতে শিখল। খাদ্য পাওয়া অনেক সহজ হওয়ায় মানুষের সংখ্যা বাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভাল জমি দখলের জন্যে মানুষের মধ্যে মারামারিও শুরু হল। যাই হোক, চাষের কৃপায় মানুষ একটু একটু করে সভ্য হল।

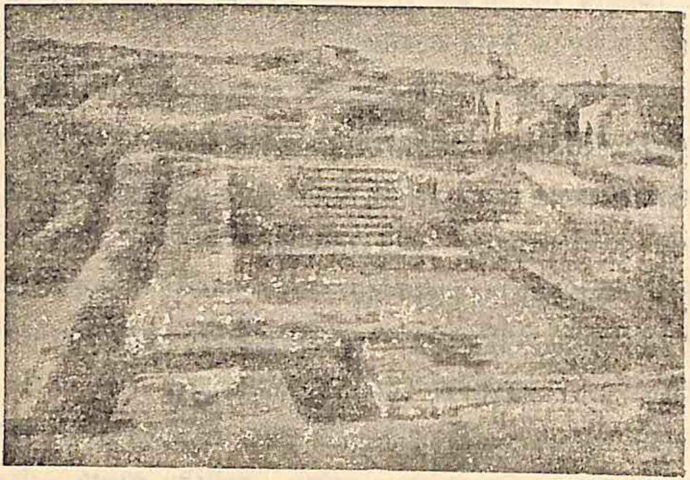
প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকা—আমাদের দেশে মানুষ প্রথম সভ্য হয়েছিল সিন্ধু উপত্যকায়। ও-অঞ্চল এখনো মরুভূমির মত, কিন্তু সেকালে সেখানে খুব বৃষ্টি হত। তাছাড়া সিন্ধু আর তার পাঁচটা শাখানদী থাকার জন্যে ওখানকার জমিও বেশ উর্বর ছিল।

চাষের সুবিধা দেখে ওখানে অনেক লোক এসে জুটেছিল। তারা সম্ভবত এসেছিল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। সিন্ধু উপত্যকায় বসবাস শুরু করে তারা সেখানে অনেক গ্রাম এবং বড় বড় শহরও তৈরি করেছিল।

আবিষ্কারের কাহিনী—আর্যরা ভারতে আসার আগেও যে ভারতে এত বড় একটা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, এ কথা চল্লিশ বৎসর আগেও কেউ জানত না। এটার প্রথম সন্ধান দিলেন এক বাঙালী পণ্ডিত। তাঁর নাম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সিন্ধু উপত্যকায় শিকার করতে গিয়ে একটা মস্ত বড় ইটের পাহাড় দেখলেন। তাঁর সন্দেহ হল, এই ইটের পাহাড়ের নীচে নীচে হয়তো প্রাচীনকালের কত কীর্তি চাপা পড়ে আছে। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে কাজ করতেন তিনি। তাঁর উপরওয়ালা মার্শাল সাহেবের চেষ্টায় এই ইটের পাহাড় খোঁড়া হল ; বেরিয়ে পড়ল প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ। এই শহরের নাম মহেঞ্জোদরো। মার্শাল সাহেবের চেষ্টায় প্রায় একই সময়ে আর একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ বেরিয়ে পড়ে। এই শহরটির নাম হরপ্পা।

শহরের বর্ণনা—মহেঞ্জোদরো সিন্ধু প্রদেশে। হরপ্পা তার চার শ মাইল উত্তরে, পশ্চিম পঞ্জাবে। এই দুটো জায়গাতে ইটের স্তূপ খুঁড়ে সেকালের যে-শহর বেরিয়ে পড়ল, সে-শহরের রাস্তা এবং বাড়িঘরগুলো যে ছক মত তৈরি করা হয়েছিল, এটা বেশ বোঝা যায়। দুধো শহরেরই এলাকা বেশ বড়। হরপ্পা ছিল দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। তার পরিধি ছিল সাড়ে তিন

মাইল। বহু লোকের বাস ছিল এই শহর দুটোয়। দুটো শহরই ছিল এক সময়কার—একই রকমের সভ্যতা ছিল দুটোতে।

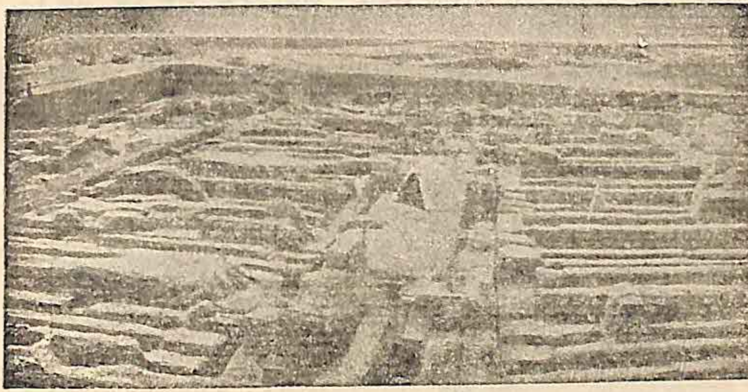


মহেঞ্জোদরোর স্নানাগার

শহরের বাড়িগুলো ছিল মোটামুটি দুই রকমের—বড় দুই-তিনতলা বাড়ি আর সারি সারি ছোট দুই-ঘরওয়ালা একতলা বাড়ি। সব ঘরেরই ভিত ছিল খুব মজবুত, মেঝে বেশ মসৃণ। সব বাড়িই ছিল পোড়া ইটের তৈরী। মহেঞ্জোদরোর একটা প্রকাণ্ড ইমারতে ছিল সেখানকার লোকের স্নান করার পুকুর, স্নানের পর কাপড় ছাড়বার ঘর—এই সব। হরপ্পার সব চেয়ে বড় বাড়িটায় শহরের শস্য রাখা হত। মন্দির বা রাজবাড়ি গোছের কোন ইমারত কোথাও কিন্তু পাওয়া যায়নি।

শহরের প্রতিটি বাড়িতে ইঁদারা ছিল, নর্দমা ছিল। শহরের

জল বের করে দেওয়ার জন্য সাধারণ নর্দমারও ব্যবস্থা ছিল। শহরের রাস্তা, বাড়ি প্রভৃতি দেখে বেশ বোঝা যায়, শহরবাসীদের কড়া নিয়মকানুন মেনে চলতে হত; তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুব দৃষ্টি রাখা হত।



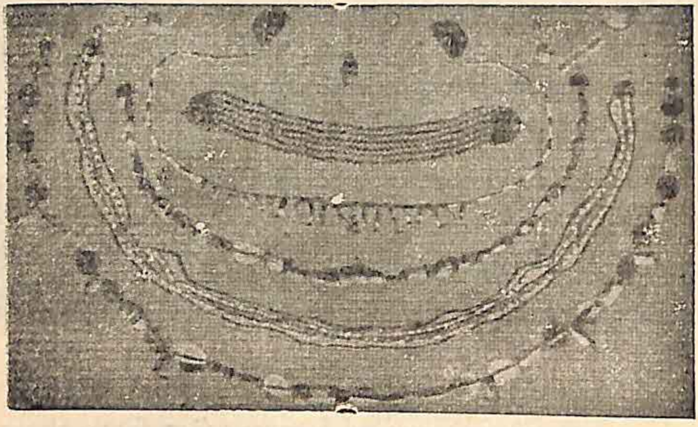
হরপ্পার শস্যাগার

শহর দুটি কম পক্ষে সাত শ বৎসর ধরে টিকে ছিল; অবশ্য এই সাত শ বৎসরের মধ্যে কয়েকবারই এগুলো বানে ভেসে যায় এবং আগুনে পুড়ে যায়। তারপর আবার নতুন করে গড়া হয়।

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার মত আরও দু-চারটে শহর যে ঐ অঞ্চলে ছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সেকালের মানুষের জীবনকথা—শহর দুটোর বাড়িঘর দেখে বোঝা যায়, বড় বাড়িগুলোতে থাকতেন সওদাগররা, আর ছোটগুলোতে তাঁদের কারিগররা। শহরের লোকের খাদ্য যোগান দিত আশপাশের গ্রামগুলো। সেকালের

লোকের প্রধান খাদ্যশস্য ছিল গম। তাছাড়া, যব, মাংস, মাছও তারা খেত। শহর দুটোতে অনেক সোনা-রূপোর আর হাতির দাঁতের গয়না পাওয়া গেছে। তা থেকে বোঝা যায়, মেয়ে-পুরুষ সবাই গয়না ভালবাসত। পুঁতির মালারও খুব চল ছিল। লোকে সুতোর কাপড় পরত। পশমেরও কিছু চল ছিল।



মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত অলঙ্কারের নমুনা

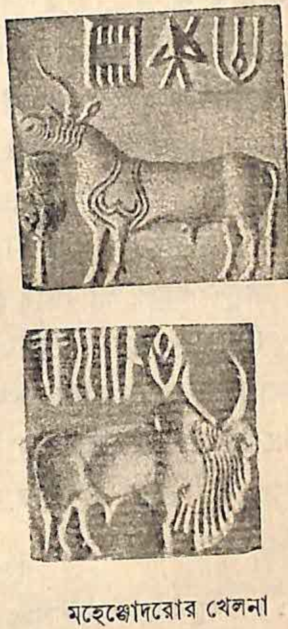
তাদের বাসনকোসনগুলো মাটির; কুমোরের চাকে এগুলো তৈরী হত। সেগুলোর উপর নানা রকমের ছবি আঁকা হত। তামা, ব্রোঞ্জ বা রূপোর জিনিসপত্রও তারা কিছু কিছু ব্যবহার করত। শহরগুলো যে-কালের, সে-কালে মানুষ ব্রোঞ্জের ব্যবহার শিখেছিল, কিন্তু লোহার ব্যবহার জানত না। তাদের কুড়ুল, বর্শা, ছুরি, কাস্তে, বঁড়শি, ক্ষুর—সবই তৈরী হত তামা বা ব্রোঞ্জ দিয়ে। তারা হাতির দাঁতের সূচ আর চিরুনি ব্যবহার করত।

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় মাটির নীচে যেসব জীবজন্তুর হাড়গোড় পাওয়া গেছে, তা দেখে জানা যায়, সেকালের লোকে গরু, মহিষ, ভেড়া আর উট পুষত।

সেকালের বাণিজ্য—এখানকার লোকেরা দেশ-বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত। পারস্য ও আফগানিস্তান থেকে কাঁচামাল আনত। মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে গিয়ে মাল কেনা-বেচা করত। মহেঞ্জোদরো আর হরপ্পা —এই দুটো শহরেই বহু সীলমোহর



সীলমোহর



মহেঞ্জোদরোর খেলনা

পাওয়া গেছে। সেসব সীলমোহরের উপর ছবি আছে কী সব লেখাও আছে। এ লেখা আজও কেউ পড়তে পারেনি।

ছেলেদের খেলনা—সেকালের ছেলেদের খেলনা ছিল প্রায় একালেরই মত—পোড়ামাটির গাড়ি, পাখির মত করে তৈরী হুইসিল বাঁশী। সেকালের লোকে সীলমোহরে শুধু চমৎকার ছবিই খোদাই করত না, সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়তেও পারত। পূর্বপৃষ্ঠায় একটা দাড়িওয়ালা মানুষের মূর্তির ছবি দেওয়া হল।

ভারত-ইতিহাসে সিন্ধু-সভ্যতার দান—সম্ভবত বাইরের আক্রমণে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সে-সভ্যতা এ দেশ থেকে কোন দিনই একেবারে মুছে যায়নি। মহেঞ্জোদরো বা হরপ্পার লোকে যে রকম পোশাক ও গয়না পরত, আমরা একালেও তাই পরি। তাদেরই মত আমাদের বাসনকোসন ও খেলনা। এসব আমরা তাদের কাছ থেকেই পেয়েছি। সেকালের মত একালেও আমরা 'মা'য়ের পূজো করি, পশুপতি শিবের পূজো করি।

সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কার হওয়ার পর আমরা জানতে পেরেছি যে, আর্যেরা ভারতে আসার আগেও ভারতে সভ্যতা ছিল। ভারতের ইতিহাস আর্যদের আসার অনেক অগেই শুরু হয়েছে। অনেকের মতে, দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানুষরাই এই সভ্যতা গড়ে তোলেন। ভারতের সভ্যতায় তাঁদের দান প্রচুর।

অনুশীলনী

১। সিন্ধু উপত্যকায় সভ্যতা গড়ে উঠবার কারণ কি?

২। সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার হল কি করে? মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা শহর কেমন ছিল, তার বর্ণনা দাও।

৩। সিন্ধু-সভ্যতায় মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল?

আর্যদের ভারতে আগমন

বৈদিক যুগ

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা সম্ভবত বাইরের শত্রুদের আক্রমণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই শত্রুরা কোথা থেকে এসেছিল ঠিক জানা যায় না। অনেকের মতে এই শত্রুরা ছিল আর্যজাতীয়। তাঁরা বলেন, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার পরেই ভারতে বৈদিক সভ্যতার পত্তন হয়েছিল। বৈদিক সভ্যতা বলতে বুঝায়—যে-আর্যেরা বেদ রচনা করেছিলেন, তাঁদের সভ্যতা।

আর্যদের আদি বাস—আর্যদের আদি বাস কোথায় ছিল, ঠিক জানা যায় না। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। একদল জার্মান পণ্ডিত বলেন, আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল উত্তর ইউরোপের সমতল ভূমিতে। অনেক ভারতীয় পণ্ডিতের মতে আর্যদের আদি বাস ছিল উত্তর মেরুর কাছে। আবার অনেকের মতে হচ্ছে, তাদের আদি বাস ছিল মধ্য এশিয়ায়। সে যাই হোক, আর্যদের একটা দল কম পক্ষে সাড়ে তিন হাজার বৎসর আগে ইরান হয়ে ভারতে আসে। প্রাচীনকালে ভারতীয় আর ইরানীরাই কেবল নিজেদের আর্য বলত। গ্রীকরাও আর্য। কিন্তু তারা ও-নামে পরিচয় দিত না। আর্যেরা ভারতে এসে প্রথমে পঞ্জাব অঞ্চলে বাস করে। ভারত জয় করা যে তাদের পক্ষে খুব সহজ হয়েছিল, তা নয়। 'বেদ' থেকে বোঝা যায়,

দস্যু অর্থাৎ ভারতের কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

আর্যদের ভারতে আগমন—আর্যেরা ছিলেন গৌরবর্ণ, দীর্ঘ-দেহ। তাঁদের নাক ছিল খাড়া। তাঁরা তীর-ধনুক, বর্শা, কুড়ুল ও তলোয়ার ব্যবহার করতেন আর ঘোড়ায়-টানা রথে চড়ে যুদ্ধ করতেন। তাঁরা লোহার ব্যবহার জানতেন। সম্ভবত আর্যরাই তাঁদের ঘোড়ায়-টানা রথ আর লোহার তলোয়ারের জোরে সিন্ধু উপত্যকার লোকদের দেশ-ছাড়া করেছিলেন।

আর্যেরা যখন ভারতে আসেন, তখন তাঁরা শহর গড়তে জানতেন না। তাঁরা আসার আগে ভারতে যারা থাকত, তাদের কাছ থেকে তাঁরা শহর তৈরি করতে শেখেন। তবে, তাঁরা চাষ জানতেন ; গরু ছাগল আর ভেড়া ছিল তাদের 'ধন' বা সম্পদ।

আর্যেরা প্রথমে পঞ্জাব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পরে তাঁরা ধীরে ধীরে গঙ্গানদীর উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েন। ক্রমে উত্তর ভারত হয়ে ওঠে আর্যাবর্ত বা আর্যদের দেশ।

বেদ—ভারতীয় আর্যদের সব চেয়ে পুরানো বই হল বেদ। যুগ যুগ ধরে প্রাচীন ঋষিদের মুখ থেকে যেসব স্তোত্র বেরিয়েছিল, সেগুলো একত্র করা হয়েছে ঋগ্‌বেদে। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যেসব শক্তি রয়েছে, সেগুলোকে দেবতা কল্পনা করে তাঁদের স্তব করেছেন আর্যেরা ; সেই দেবতাদের কাছে নিজেদের প্রার্থনা জানিয়েছেন এইসব স্তোত্রে। ভারতের প্রাচীন আর্যেরা এইসব স্তোত্র গান করতেন। কি নিয়মে এইসব স্তোত্র গাইতে হয়, তার উপদেশ আছে সামবেদে। ঋক্ আর

সাম ছাড়া আরও দুটো বেদ আছে—যজুঃ আর অথর্ব। যজুর্বেদে আছে গদ্যে রচিত স্তোত্র আর ঋকের মন্ত্রগুলো। অথর্ববেদে ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র আছে, গদ্যও আছে। সব বেদের প্রধান হচ্ছে ঋগ্‌বেদ। সেকালের আর্যেরা বেদ মুখস্থ করে রাখতেন। কাজেই বেদ মুখে মুখেই চলে আসছিল। অনেক কাল পরে এগুলো লেখা হয়।

বৈদিক যুগে মানুষের জীবনধারা—প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর আগে, ভারতের আর্যদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল, তাঁরা কি কাজ করতেন, কি খেতেন-পরতেন, কেমন করে লড়াই করতেন, কোন্ দেবতার পূজো করতেন, কি করে নিজেদের সমাজ গড়তেন, সমাজ রক্ষা করতেন—এ সমস্ত বেশ ভাল-ভাবেই জানা যায় বেদ থেকে। ঋগ্‌বেদে আমরা পাই—আর্যেরা গান্ধার থেকে গঙ্গা-যমুনার ধার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁরা চাষবাস করেন, গরু-ভেরা তাদের বড় সম্পদ। তাঁদের অনেক দল। মাঝে মাঝে এক দলের সঙ্গে অন্য দলের যুদ্ধ চলে।

শাসন-ব্যবস্থা—আর্যেরা শহর গড়তেন না। কয়েকটা পরিবার মিলে গ্রাম তৈরি করতেন। গ্রামের মোড়লকে বলা হত গ্রামণী। কয়েকটা গ্রাম মিলিয়ে হত বিশ্ বা জন। বিশের মোড়ল হতেন রাজা। তাঁকে বিশ্‌পতি বা গোপও বলা হত। রাজা সভা বা সমিতির পরামর্শ নিয়ে শাসনকার্য চালাতেন। সভা বা সমিতিতে সকলেরই নিজের নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকত। রাজার বড় কর্মচারী ছিলেন পুরোহিত

আর সেনানী। পুরোহিতই ছিলেন মন্ত্রী। যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার ভার থাকত সেনানীর উপর। রাজারা নির্বাচিত হতেন। বেদের যুগে রাজার ছেলে হলেই রাজা হওয়া চলত না। সেকালে ভালভাবে শাসন চালাতে না পারলে রাজাকে বিদায় দেওয়ারও রীতি ছিল।

শ্রেণীবিভাগ—বৈদিক আর্য সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—পুরোহিত, ক্ষত্রিয় আর চাষী। পুরোহিতরা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা) যাগযজ্ঞাদি করিতেন, ক্ষত্রিয়রা দেশরক্ষা ও দেশ জয় করতেন, আর চাষীরা (অর্থাৎ বৈশ্যরা) চাষ ও পশুচারণ করতেন, ব্যবসাও করতেন। সমাজে পুরোহিতদের খুব সম্মান ছিল। প্রত্যেক গ্রামের মোড়লেরই পুরোহিত থাকত। নতুন কোন কাজে হাত দিতে হলেই পুরোহিতের পরামর্শ নেওয়া হত। তখনও সমাজে সত্যিকার জাতিভেদ দেখা দেয়নি। বৈদিক যুগের শেষ দিকে এটা সৃষ্টি হয়েছে। যেসব আদিবাসী আর্যদের বশ মেনেছিল, তাদের নিয়ে শূদ্রবর্ণ গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়।

চতুরাশ্রম—বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য, এই তিন শ্রেণীর লোককেই সমাজের কতকগুলো আদর্শ মেনে চলতে হত। এই তিন বর্ণের আর্যেরা চারিটি পর্যায়ের ভিতর দিয়ে জীবন কাটাতেন। এই পর্যায়গুলোকে বলা হত আশ্রম। চারটি আশ্রমের নাম ছিল—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। প্রথম পর্যায়ে আর্যসন্তানরা গুরুর বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখতেন; দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা ঘর-গৃহস্থালি করতেন; তৃতীয়

পর্যায়ে সস্ত্রীক বনে গিয়ে বাস করতেন ; আর চতুর্থ পর্যায়ে সংসারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে তাঁরা সন্ন্যাস নিতেন।

খাদ্য ও বস্ত্র—বেদের যুগে আর্যেরা বুনো পশুর চামড়া পরতেন, সূতী কাপড়ও পরতেন। তাঁদের মধ্যে সোনার গয়নার চল ছিল। পুরুষেরা মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন। তাঁদের সাধারণ খাদ্য দুধ, গম আর যব। তাঁরা মাংসও খেতেন। সোমরস বলে এক রকম মাদক পানীয়ের তাঁরা খুব ভক্ত ছিলেন।

আমোদ-প্রমোদ—শিকার করা, বাজি রেখে পাশা খেলা আর রথ দৌড়ানো ছিল আর্যদের প্রধান আমোদ-প্রমোদ। পাশা খেলায় সে-যুগেও অনেকে সর্বস্বান্ত হতেন।

মেয়েদের অবস্থা—বৈদিক সমাজে মেয়েদের বেশ মর্যাদা ছিল। তাঁরা নিজেদের বর বেছে নিতেন। কেউ কেউ বিয়ে করতেন না। সভায় এসে পুরুষদের সঙ্গে সমান মর্যাদায় নানা বিষয়ের আলোচনায় যোগ দিতেন। বেদের অনেক মন্ত্র মেয়েদের রচনা। মেয়েরা দরকার হলে যুদ্ধ পর্যন্ত করতে পারতেন। কোন কাজেই মেয়ে বলে তাঁদের বাধা ছিল না।

দেব-দেবীর যজ্ঞ—সে যুগের আর্যদের প্রধান দেবতা ছিলেন ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র আর অগ্নি। বৃষ্টি, ধন, যুদ্ধজয় প্রভৃতি নানা রকম কামনা করে দেবতাদের পুজো দেওয়া হত ; দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হত। প্রতি যজ্ঞেই স্তোত্রপাঠ হত ; কখনও কখনও পশুবলিও দেওয় হত। যজ্ঞের আগুনে ঘি আর সোমরস ঢালা ছিল যজ্ঞের একটা বড় অঙ্গ। যবের ছাতু আর দই দিয়ে তৈরী এক রকম পিঠেও যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হত।

জ্ঞান-বিজ্ঞান—আর্যেরা কাঠের কাজ, কাপড় বোনা প্রভৃতি কয়েকটা শিল্পকাজ জানতেন। যজ্ঞের বেদী রচনায় তাঁদের



বৈদিক কালের যজ্ঞ

জ্যামিতিক জ্ঞানের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বেদের যুগের আর্যেরা জ্যোতিষ ও চিকিৎসাবিদ্যাও জানতেন।

অনুশীলনী

১। আর্যেরা কোথা থেকে কোন্ পথে ভারতে আসেন ?

২। আর্যেরা ভারতে রাজ্য বিস্তার করলেন কিসের জোরে ?

৩। বেদ কি ? বর্ণ কি ? আশ্রম কি ?

৪। বৈদিক যুগের খাওয়া-পরা, সমাজের গড়ন, মেয়েদের অবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে বল।

পৌরাণিক যুগ

রামায়ণ ও মহাভারত

ভারতে প্রবেশ করে আর্যেরা উত্তর ভারতের নানা স্থানে বসতি স্থাপন করতে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় আর্যদের এক-একটা 'কুল' অর্থাৎ দল এক এক জায়গায় রাজত্ব করত। এক কুলের সঙ্গে আর এক কুলের লড়াই হত; লড়াই হত আদিবাসী অনার্যদের সঙ্গেও। এই সব লড়াইয়ের বীরদের নিয়ে তারা গান বাঁধত, কাহিনী বলত। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী এইভাবে রচিত হয়েছিল। সে কাহিনী নিয়েই পরে মহাকাব্য তৈরী হয়েছে। রামায়ণের রাম দক্ষিণ ভারতের অনার্যদের মধ্যে আর্যদের ধর্ম ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে তাঁর খুব নাম-ডাক হয়; ফলে, তাঁর সম্বন্ধে মহাকাব্য তৈরী হয়ে যায়। মহাভারতের পাণ্ডবরা কুলের স্বার্থে রাজ্যশাসন না করে ধর্মের ভিত্তিতে রাজ্যশাসনের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। এই কীর্তির জন্যে লোকে তাঁদের গুণগান করত। তা থেকে তাঁদের নিয়েও মহাকাব্য রচিত হয়ে গেল।

প্রায় একই সময় থেকে পুরাণ তৈরী শুরু হয়। পুরাণ হল পুরাতন কথা। নানা পুরানো কথা, রাজবংশের তালিকা, ধর্মের কথা, সমাজকথা, দেবতাদের মাহাত্ম্য প্রভৃতি মুনিঋষিদের সমাবেশে পাঠ করা হত। তা থেকেই পুরাণের সৃষ্টি।

রামায়ণ ও মহাভারত—রামায়ণ ভারতের আদি মহাকাব্য

রামায়ণের কবি বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষার আদি কবি। মহাভারত রচনা করেছিলেন মহর্ষি বেদব্যাস। এ দুটো মহাকাব্যই রচিত হয়েছিল সাধারণ লোকের জন্যে। আমাদের দেশের সাধারণ লোক আজও এই দুই মহাকাব্যকেই তাদের সব চেয়ে বড় শাস্ত্র বলে মানে। বেদ-বেদাঙ্গ পণ্ডিতদের জন্যে। বেদ-বেদাঙ্গের সার কথাটা দেশের সাধারণ লোকে পায় এই মহাকাব্যে। আর সেই সঙ্গে পায় চমৎকার গল্প।

রামায়ণ-মহাভারত শুধু গল্প নয়—এ দুটিতে আমাদের দেশের এককালের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। এ দুই মহাকাব্য পড়লে, বিশেষ করে মহাভারত পড়লে, বেদের পরবর্তী যুগের একটা পুরো ছবি আমাদেব চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বেদের মন্ত্র পড়তে একটু এদিক-ওদিক হলেই মহাপাতক হয়—শাস্ত্রে এই রকম নির্দেশ আছে; তাই এই মন্ত্রগুলো যেমনটি রচিত হয়েছিল, আজও তেমনটিই আছে। কিন্তু রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনী মূল থেকে কালে কালে অনেক বদল হয়েছিল ; কাহিনীগুলো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছেও কিছু কিছু বদলে গিয়েছিল। আমাদের বাংলা রামায়ণ লিখেছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। তাঁর রামায়ণের কাহিনী বাল্মীকি মুনির সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে হুবহু মেলে না। এমনি-ভাবেই প্রতি অঞ্চলের লোক কাহিনীগুলোকে নিজেদের মনের মত করে গড়ে নিয়েছে সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারতও প্রথমে যা ছিল, পরের দিকে তা থাকেনি। বহুকাল ধরে মহাকাব্য দুটো গাওয়া হত—মুখে-মুখেই চলে আসছিল। তার ফলে,

এগুলোতে তখন কিছু কিছু করে নতুন কথা যোগ করা হতে থাকে। গুপ্তযুগে এগুলো প্রথম লিখে রাখা হয়।

রামায়ণের কাহিনী

রামচন্দ্র—উত্তর ভারতে কোশল বলে এক রাজ্য ছিল। অযোধ্যা ছিল তার রাজধানী। রাজা দশরথ বুড়ো হয়েছিলেন; তিনি বড় ছেলে রামচন্দ্রকে যুবরাজ করতে চাইলেন। খবর শুনে রামচন্দ্রের সৎমা কৈকেয়ী দশরথকে এসে বললেন, "একবার অসুখের সময় আমি আপনার খুব সেবা করেছিলাম। তখন আপনি আমাকে দুটো বর দিতে চেয়েছিলেন। এখন আমি সেই বর দুটো চাই। প্রথম বর—আমার ছেলে ভরতকে রাজা করতে হবে। দ্বিতীয় বর—রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে পাঠাতে হবে।"

রামের বনগমন ও রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ—বাবার কথা রাখার জন্যে রাম নিজে যেচে বনে চললেন। মনের দুঃখে দশরথ মারা গেলেন। ভরত রামকে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু রাম ভরতকেই রাজ্যভার দিয়ে, ভাই লক্ষ্মণ আর স্ত্রী সীতাকে নিয়ে দক্ষিণ ভারতের দণ্ডক বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এক দিন লঙ্কাদ্বীপের রাক্ষস-রাজা রাবণ এসে সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেলে। রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে খুঁজতে বের হলেন। কিষ্কিন্ধার বানরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে রাম জানতে পারলেন, সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাম তখন বানর-সেনাদের সাহায্যে সাগরে সেতু তৈরি করে

লঙ্কায় পৌঁছালেন। লঙ্কার রাজা রাবণ, তাঁর ভাইরা, তাঁর ছেলেরা সকলেই ছিলেন মহা মহা বীর। কিন্তু রাবণের ভাই



রামের বনগমন

বিভীষণ রামের পক্ষ নেওয়ায় রামচন্দ্র আর তাঁর বানর-সৈন্যরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জয়ী হলেন। রাবণের সবংশে মৃত্যু হল।

রামের রাজ্যলাভ ও সীতার বনবাস—বিভীষণকে লঙ্কার

রাজ্য করে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে দেশে ফিরলেন। চৌদ্দ বৎসর পুরো হয়ে গিয়েছিল রাম ফিরতেই ভরত তাঁকে রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। এদিকে, সীতা বহু দিন রাবণের পুরীতে একা ছিলেন বলে, লোকে নানা কথা বলতে লাগল; সীতার নামে নিন্দা রটতে লাগল। তা শুনে রাম সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। কিছু দিন পরে সেখানে সীতার দুটি ছেলে হল—লব আর কুশ। তারা বাবা রামচন্দ্রের মতই বড় বীর হয়ে উঠল।

রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও মৃত্যু—রামচন্দ্র নিজেকে দেশের সব চেয়ে বড় রাজা বলে প্রমাণ করার জন্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ঘোড়া ছেড়ে দিলেন। তাঁর দুই ছেলে সে ঘোড়া ধরল। রামচন্দ্র যুদ্ধ করতে এলেন। যুদ্ধ করতে করতে তিনি ছেলেদের পরিচয় পেলেন। যুদ্ধ শেষ হল। রাম ঘোড়া নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। তারপর বাল্মীকি সীতাকে ও ছেলে দুটিকে পাঠিয়ে দিলেন অযোধ্যায় রামের কাছে। তখন রাম সীতাকে বললেন, "তুমি যে সতী, প্রজাদের সামনে তার প্রমাণ দিতে হবে।" অপমানে লজ্জায় সীতার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা রইল না; তিনি পাতালে চলে গেলেন। সীতার শোকে কাতর হয়ে রামও ছেলেদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পরলোকে গমন করলেন। তাঁর অন্য তিন ভাইও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

রামায়ণের এ কাহিনী উদ্ভট বলে মনে হয়। কিন্তু, এটা সত্যি যে, রামায়ণে 'বানর'রা সত্যিই বাঁদর ছিল না; তারা ছিল দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী। আর রামায়ণের 'রাক্ষস'রাও

ছিল তাই। রাক্ষসরা আর্যদের যজ্ঞ পণ্ড করত, আশ্রমবাসী মুনি-ঋষিদের উপর উৎপাত করত। বানররা আর্য সভ্যতা মেনে নিয়েছিল ; কিন্তু রাক্ষসরা মানেনি।

মহাভারতের কাহিনী

কৌরব-পাণ্ডব—এখনকার মীরাট শহরের কাছে ছিল প্রাচীন হস্তিনাপুর। হস্তিনাপুরে শান্তনু বলে এক রাজা ছিলেন। তাঁর তিন ছেলে—ভীষ্ম, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। ভীষ্ম বাবাকে খুশী করবার জন্য রাজা হওয়ার অধিকার ত্যাগ করেন। চিত্রাঙ্গদ অল্প বয়সে যুদ্ধে মারা যান। ফলে, সবার ছোট বিচিত্রবীর্য হস্তিনার রাজা হন। বিচিত্রবীর্যের দুই ছেলে। বড় ছেলে ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ, তাই ছোট ছেলে পাণ্ডু বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের ছিল দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি এক শ ছেলে ; আর পাণ্ডুর ছিল পাঁচ ছেলে—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের বলা হত কৌরব, আর পাণ্ডুর ছেলেদের বলা হত পাণ্ডব।

কৌরবদের হিংসা—পাণ্ডু যখন মারা যান, তাঁর ছেলেরা তখন ছোট। তাই ধৃতরাষ্ট্রের উপর পড়ে রাজ্যের ভার। কৌরবরা আর পাণ্ডবরা এক সঙ্গে বড় হতে থাকেন। পাণ্ডবরা সব দিক থেকে কৌরবদের উপরে ছিলেন। সৎগুণের জন্য প্রজারা পাণ্ডবদের ভালবাসত। গায়ের জোরে বা ধনুর্বিদ্যায় কৌরবরা তাঁদের সঙ্গে পারত না। ফলে, কৌরবরা পাণ্ডবদের হিংসে করত ; তাঁহাদের মেরে ফেলবার চেষ্টা করত।

একবার দুর্যোধন পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার ফন্দি আঁটলেন। চালাকি করে পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠানো হল। পাণ্ডবরা আগেই দুর্যোধনের মতলব বুঝতে পেরেছিলেন। বারণাবতে পাণ্ডবদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল গালা দিয়ে তৈরী ঘরে। একদিন রাত্রে ভীম সে ঘরে আগুন দিয়ে মা-ভাইদের নিয়ে সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গেলেন। তারপর পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণের বেশে ঘুরতে ঘুরতে পাঞ্চাল রাজ্যে গিয়ে হাজির হলেন। পাঞ্চাল-রাজের মেয়ে দ্রৌপদীর তখন স্বয়ংবর হচ্ছিল। অনেক রাজা আর রাজপুত্র এসেছিলেন তাঁকে বিয়ে করার আশায়। কিন্তু তাঁদের হারিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করলেন। পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে বিয়ে করলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থ—পাণ্ডবরা বেঁচে আছেন জেনে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের ডেকে রাজ্যের অর্ধেকটা তাঁদের দিয়ে দিলেন। পাণ্ডবরা নতুন রাজ্য খাণ্ডবপ্রস্থে এসে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের মত এক পুরী তৈরি করলেন। পুরীর নাম হল ইন্দ্রপ্রস্থ। দিল্লী শহরের বাইরেই ছিল যুধিষ্ঠিরের এই রাজধানী।

পাণ্ডবদের বাহুবলে আর যুধিষ্ঠিরের ধর্ম-শাসনের গুণে খাণ্ডবপ্রস্থের খুব উন্নতি হল। যুধিষ্ঠির তখন রাজসূয় যজ্ঞ করলেন। এই যজ্ঞে এসে দুর্যোধন পাণ্ডবদের সৌভাগ্য দেখে আবার হিংসায় জ্বলে উঠলেন।

পাশা খেলা—হস্তিনাপুরে ফিরে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার জন্য ডাক দিলেন। কৌরবদের পক্ষে খেললেন দুর্যোধনের মামা শকুনি। বাজি ধরে খেলা চলল। শকুনি

চালাকি করে সব বাজিই জিতলেন। বাজির শর্তমত যুধিষ্ঠির রাজ্য ছেড়ে চার ভাই আর স্ত্রীকে নিয়ে বারো বৎসরের জন্য বনবাস আর এক বৎসরের জন্য অজ্ঞাতবাসে গেলেন। এই তেরো বৎসর পাণ্ডবদের খুব কষ্টে কাটল।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—তেরো বৎসরের পর ফিরে এসে পাণ্ডবরা নিজেদের রাজ্য ফিরে চাইলে কৌরবরা বললেন, "বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।" ফলে যুদ্ধ হল। ভারতের সমস্ত রাজাই কোন-না-কোন পক্ষে যোগ দিলেন। কৌরব পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি বড় বড় বীর আর দুর্যোধনেরা এক শ ভাই। পাণ্ডব পক্ষেও পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই, কৃষ্ণ, সাত্যকি, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ প্রভৃতি বীর। দুই পক্ষেই লক্ষ লক্ষ সৈন্য। কুরুক্ষেত্রের মাঠে আঠারো দিন ধরে ঘোরতর যুদ্ধ চলল। যুদ্ধে কৌরবরা হেরে গেলেন। তাঁদের সকলেই মারা পড়ল। সারা দেশে নামকরা ক্ষত্রিয় বলে বড় কেউ থাকল না। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজা হলেন।

এর পর যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ভারতের রাজচক্রবর্তী হন। কিন্তু আত্মীয়-বন্ধুদের মেরে রাজ্য নিতে হয়েছিল বলে রাজত্ব তাঁর ভাল লাগল না। অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়ে, চার ভাই আর স্ত্রীকে নিয়ে তিনি হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করলেন।

এই মূল কাহিনী ছাড়া মহাভারতে সেকালের ছোট-বড় অসংখ্য গল্প আছে—যেমন দুষ্মন্ত-শকুন্তলার গল্প, নল-দময়ন্তীর গল্প, ইত্যাদি। তাছাড়া, মহাভারতে আর একটা মহারত্ন আছে, সেটা গীতা।

কুরুক্ষেত্রের মাঠে যুদ্ধে নেমে অর্জুন দেখলেন, শত্রুপক্ষে যাঁরা আছেন তাঁদের অনেকেই তাঁর পরমাত্মীয় ও গুরুজন। তাঁদের মেরে রাজ্য নেওয়ার কথা অর্জুন ভাবতে পারলেন না।



কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জুন

তিনি অস্ত্র ত্যাগ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের সারথি। অর্জুন যুদ্ধ করতে চান না দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যেসব উপদেশ দিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছিলেন, সেই উপদেশগুলো আছে এই গীতা-গ্রন্থে। সে সব উপদেশ বুঝে চললে মানুষ সব কালেই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে পারে।

পৌরাণিক যুগে মানুষের জীবনযাত্রা

ভারতে আসার আগে শহর কাকে বলে, আর্যেরা তা জানতেন না। এদেশে ছোট বড় রাজ্য স্থাপন করার পর

বিজিত অনার্যদের দেখাদেখি আর্যেরাও শহর তৈরি করতে লাগলেন। মহাকাব্যে অযোধ্যা বা ইন্দ্রপ্রস্থের যে বর্ণনা পাই, তা থেকে বোঝা যায়, আর্যদের শহরগুলো বেশ বড় ও সমৃদ্ধ ছিল।

রাজশক্তি—বৈদিক যুগে রাজারা তেমন শক্তিশালী ছিলেন না। প্রজারা ইচ্ছা করলেই রাজাকে তাড়িয়ে দিতে পারত। মহাকব্যের যুগে রাজাদের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। প্রজারা দুর্যোধনের শাসন পছন্দ না করলেও এবং যুধিষ্ঠিরকে রাজা করতে চাইলেও, কিছু করে উঠতে পারেনি। দুর্যোধন নানা উপায়ে তাদের সকলকে ঠাণ্ডা করে রেখেছিলেন ;—এসব কথাও মহাভারতে আছে। প্রজারা সীতার চরিত্রে সন্দেহ করায় রাজা রাম সীতাকে নির্বাসনে পাঠাতে বাধ্য হন। এ থেকে বোঝা যায়, রাজা প্রজাদের কথা একেবারে ফেলতে পারতেন না। মহাকাব্যের যুগে ভারতের সব রাজ্যেই যে রাজা ছিল, এমন নয়। অনেক রাজা তখনকার দিনে নিজেই ছিলেন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি—শাসন-ব্যাপারে সর্বময় কর্তা। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করা, বা না-করা ছিল রাজার ইচ্ছাধীন। ছোট রাজ্যে প্রজারাই শাসনকাজ চালাত।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব—বৈদিক যুগে সমাজের মাথা ছিলেন পুরোহিতরা। মহাকাব্যের যুগে যাগযজ্ঞে লোকের বিশ্বাস কমে আসে, আর ক্ষত্রিয় রাজারা সমাজের প্রধান হয়ে ওঠেন। তখনও লোকে ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করত বটে, তবে ব্রাহ্মণরাও কোন কোন বিষয়ে ক্ষত্রিয়দের গুরু বলে মেনে নিতেন। অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি নিতেন, ক্ষত্রিয়ের মত

যুদ্ধ করতেন। বৈদিক যুগের তুলনায় মহাকাব্যের যুগে সমাজের বর্ণগুলির মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ দেখা দিয়েছিল। তবে এ যুগেও রাজারা অন্য বর্ণের মেয়ে বিয়ে করতেন।

মেয়েদের অবস্থা—বৈদিক যুগের তুলনায় মহাকাব্যের যুগে মেয়েদের স্বাধীনতা অনেক কমে গিয়েছিল। এ যুগের রাজকন্যারা নিজেদের বর বেছে নিতেন বটে কিন্তু কোন মেয়েই যুদ্ধ করতে যেতেন না। এ যুগে স্ত্রীলোকদের স্বভাবতঃ দুর্বল বলে মনে করা শুরু হয়।

দৃঢ়তর সমাজ-বন্ধন—বৈদিক যুগের মানুষ ছিল সরল প্রকৃতির। তাদের উপর সমাজের বিশেষ কোন বন্ধন পড়েনি। মহাকাব্যের যুগের মানুষ নানা সামাজিক বন্ধন স্বীকার করে নেয়, তাই তাদের জীবন আগের তুলনায় জটিল হয়ে পড়ে। রাজভক্তি, গুরুভক্তি, পিতৃভক্তি, পতিভক্তি প্রভৃতি মানুষের সামাজিক গুণকে বড় করে দেখার রীতি এ-যুগেই দেখা দেয়। বেদের যুগে মানুষের মন যে-গুণ দেখে খুশী হত, সেটাকেই ভাল বলত, কিন্তু তা নিয়ে কোন রকম বাড়াবাড়ি করত না। মহাকাব্যের যুগে এই বাড়াবাড়ি দেখা দেয়।

অনুশীলনী

১। রামায়ণ ও মহাভারতে কোন্ যুগের কাহিনী বলা হয়েছে?

২। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী সংক্ষেপে লিখ।

৩। রামায়ণ ও মহাভারত কি আজগুবি গল্প? বানর বা রাক্ষস কারা?

৪। মহাকাব্যের যুগে মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল? বৈদিক যুগের মানুষের জীবনের সঙ্গে তার তুলনা কর।

মহাবীর জিন ও গৌতম বুদ্ধ

আর্যেরা এ দেশের আদিবাসীদের জয় করে যখন রাজ্য বিস্তার করে চলছিলেন, ক্ষত্রিয়দের প্রভাব তখন ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। বৈদিক যুগে পুরোহিতরা ছিলেন সমাজের মাথা ; ক্রমে রাজারা সমাজের মধ্যে বড় হয়ে উঠলেন। ফলে, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের একটা চাপা বিরোধ শুরু হল।

ঐ সময় থেকেই যাগযজ্ঞ করলে মুক্তি পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণদের এ কথায় লোকের বিশ্বাস কমে যেতে থাকে। তখন ভারতের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে নতুন ভাবে চিন্তা করতে থাকে। সে সব বিষয় বলা হয়েছে উপনিষদে।

স্বাধীন চিন্তা—উপনিষদে যে চিন্তাধারা আছে, তাতে বেদকে মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু লোকে ক্রমে বেদকে না মেনে স্বাধীনভাবেই চিন্তা করতে শুরু করে। ক্ষত্রিয়কুমার গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর জিন যে মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন, তাতে বেদকে মানা হয়নি। সে হল আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগেকার কথা।

মহাবীর

মহাবীরের জন্ম হয়েছিল বুদ্ধের কয়েক বৎসর আগে। তিনি জন্মেছিলেন বৈশালীর এক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় বংশে। তাঁর প্রথম জীবনের নাম ছিল বর্ধমান। ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার

ত্যাগ করে তিনি দীর্ঘ বারো বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। অবশেষে তিনি যখন সাধনায় জয়ী হলেন, তখন তাঁর নাম হয় মহাবীর ও জিন। 'জিন' শব্দের অর্থ বিজয়ী।

জৈনধর্ম—মহাবীরের প্রচারিত ধর্মকে জৈনধর্ম বলা হয়। এই ধর্মের মূল হল—অহিংসা, সত্য-আচরণ আর ইন্দ্রিয় সংযম। মহাবীর বলতেন, যাগযজ্ঞ ও পশু-বলির কোন প্রয়োজন নেই; সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান আর সৎ আচরণ করলেই মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে।


মহাবীর

মহাবীর ত্রিশ বৎসর ধর্ম প্রচার করেন এবং বাহাত্তর বৎসর বয়সে দক্ষিণ বিহারে রাজগির ও নালন্দার কাছে 'পাবা' (বা অপাপপুরী) বলে একটা গ্রামে তাঁর মৃত্যু হয়। এই পাবা গ্রামে জৈনদের একটা সুন্দর মন্দির আছে।

গৌতম বুদ্ধ

সিদ্ধার্থ—হিমালয়ের কোলে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলবাস্তু বলে একটা রাজ্য ছিল। আড়াই হাজার বৎসর আগে সেখানকার ক্ষত্রিয় শাক্য-বংশের নায়ক ছিলেন রাজা

শুদ্ধোদন। এই শুদ্ধোদনের ছেলে ছিলেন সিদ্ধার্থ। তাঁর মায়ের নাম ছিল মায়া দেবী।

জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী—একবার মায়া দেবী লুম্বিনী উদ্যানে বেড়াতে গিয়ে রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, একটা সাদা হাতি তাঁর পেটে ঢুকছে। স্বপ্নের কথা শুনে জ্যোতিষীরা বললেন,—মায়াদেবীর ছেলে হবে, সেই ছেলে রাজচক্রবর্তী হবে, নয়তো মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

সিদ্ধার্থের প্রথম জীবন—সিদ্ধার্থ জন্মাবার পর সাত দিনের দিন মায়া দেবী মারা গেলেন। ছেলেবেলা থেকে সিদ্ধার্থের ঝোঁক ছিল ধর্মের দিকে। অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী হয়েও তিনি শিকার করতেন না, পশু-পাখির দুঃখেও তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। কোন রকম আমোদ-প্রমোদ তাঁর ভালো লাগত না। ছেলের ভাবগতি দেখে শুদ্ধোধন ছেলেকে বিয়ে দিয়ে সংসারে বাঁধতে চাইলেন। যশোধারা নামে শাক্য-বংশেরই এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিয়ে হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য—পরপর কয়েক দিন নগর দেখতে বেরিয়ে সিদ্ধার্থ এমন কয়েকটি দৃশ্য দেখলেন, যার ফলে তিনি বুঝলেন, সব মানুষই রোগে শোকে ভোগে, বুড়ো হয়, মারা যায়। মরার পর আবার জন্মায়, আবার ভোগে। কি করে মানুষ এই গোলকধাঁধা থেকে বেরোতে পারে—এই চিন্তা তাঁকে ব্যাকুল করে তুলল। এর পরে তিনি দেখলেন এক সন্ন্যাসীকে। ফলে, মানুষের মুক্তির পথ বের করার সংকল্প



বুদ্ধদেব

নিয়ে এক রাতে তিনি তাঁর স্ত্রী ও নবজাত পুত্রকে রেখে গৃহত্যাগ করলেন। তখন তাঁর বয়স উনত্রিশ বৎসর।

তপস্যা ও বোধিলাভ—সিদ্ধার্থ অনেক জায়গা ঘুরে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁদের কাছে উপদেশ নিয়ে গয়ার কাছে উরুবিল্ব বলে এক নির্জন জায়গায় এসে তিনি তপস্যায় বসলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, 'এই আসনে আমার শরীর শুকিয়ে যায় তো যাক ; যত দিন বোধি অর্থাৎ সত্যজ্ঞান লাভ না করছি, ততদিন এ আসন ছাড়ব না।'

দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে চলল তাঁর তপস্যা। তাঁর শরীর শুকিয়ে গেল। এক দিন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মনে হল, শরীরকে কষ্ট দিয়ে কোন লাভ নেই। তার পর থেকে তিনি একটা পিপ্পল গাছের তলায় বসে ধ্যান করতে লাগলেন। এইখানে সুজাতা বলে এক গৃহস্থ বধূ তাঁকে বনদেবতা মনে করে তার মানসিক করা পরমান্ন খাইয়ে গেল। মোট সাত বৎসর সাধনার পর সিদ্ধার্থের বোধি লাভ হল ; তিনি বুদ্ধ হলেন। সিদ্ধার্থ ছিলেন গৌতম-শাক্য-বংশের লোক, তাই তাঁর আর এক নাম ছিল গৌতম। এই জন্যে ইতিহাসে তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত। যে গাছের নীচে তপস্যা করে তিনি বোধি বা জ্ঞান লাভ করেন, তাকে বলে বোধিবৃক্ষ। মূল বোধিবৃক্ষ এখন নেই, তারই একটি ডাল সেখানে লাগানো হয়েছিল। সেটিই আজ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুদ্ধের সিদ্ধিলাভের এই জায়গাকে বলা হয় বোধ্-গয়া বা বুদ্ধগয়া।

ধর্ম প্রচার—বোধিলাভ করার পর বুদ্ধ কাশীর কাছে সারনাথে গিয়ে তাঁর প্রথম পাঁচ জন শিষ্যকে দীক্ষা দেন। এখানে পরে যে স্তূপ তৈরী হয়েছিল, সেটা এখনও আছে। ক্রমে অনেকেই বুদ্ধের কাছে উপদেশ নিতে আসতে থাকে। কৌশলরাজ প্রসেনজিৎ আর মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁর ভক্ত হন। তিনি দীক্ষা দেওয়ার সময় ছোট-বড় বিচার করতেন না। বণিকশ্রেষ্ঠ অনাথপিণ্ডদ থেকে আনন্দ উপালির মত সাধারণ দরিদ্র লোক—যে-ই তাঁর কাছে গিয়েছে, সে-ই তাঁর করুণা লাভ করেছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। বহু লোককে দীক্ষা দেওয়ার পর আশি বৎসর বয়সে কুশীনগরে তাঁর দেহান্ত ঘটে।

বৌদ্ধধর্ম—বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তাকে বলে বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্মের মূল কথা হল—মানুষ যত দিন ভোগের কামনা না ছাড়বে, ততদিন সে জন্ম-মৃত্যুর গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পাবে না। মানুষের মুক্তি তার নিজের হাতে, আর কেউ তা দিতে পারে না। কামনাকে জয় করতে হবে; তবেই পাওয়া যাবে মুক্তি। ভগবান আছেন কি নেই, জেনে কোন লাভ নেই। থাকলে তিনিও মুক্তি দেবার মালিক নন। কি করে কামনাকে জয় করা যায়, বুদ্ধ তার উপায় বলে যান। তিনি বলেন, জ্ঞান, শীল আর সমাধির দ্বারাই কামনাকে জয় করা সম্ভব।

বৌদ্ধসংঘ—বুদ্ধ সংঘ স্থাপন করে যান। 'সংঘ' শব্দের অর্থ একত্র থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ধর্মাচরণ করার ব্যবস্থা।

সংঘের বাইরেও গৃহস্থেরা বুদ্ধের ধর্ম পালন করতে পারত বুদ্ধ নিজেকে কোন দিন ভগবান বলে প্রচার করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ভগবান বলে প্রচার করতে থাকে। হিন্দুরাও তাঁকে ভগবানের দশ অবতারের এক অবতার বলে গ্রহণ করে নিয়েছে।

অনুশীলনী

১। বৈদিক যুগের পর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কি জান ?

২। মহাবীর জিন কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?

৩। গৌতম বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে কি জান ?

৪। বুদ্ধদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ ?

দিগ বিজয়ী আলেকজাণ্ডার

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় দেড় শ বৎসর পরের কথা। মগধে তখন রাজত্ব করছেন নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দ। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখন অনেকগুলো ছোট বড় রাজ্য ছিল; তাদের মধ্যে শক্তিশালী ছিল ঝিলম আর চেনাব নদীর মাঝখানের একটি রাজ্য। এই রাজ্যের রাজা পুরুর শত্রু ছিলেন তক্ষশিলার (এখনকার রাওয়ালপিণ্ডি) রাজা অম্ভি; পুরুর রাজ্যের দক্ষিণ আর পূর্ব সীমান্তে যে রাজারা ছিলেন, তাঁরাও পুরুকে হিংসা করতেন। ভারতের যখন এমনি অবস্থা, তখন এল আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ।

আলেকজাণ্ডার

ইউরোপের দক্ষিণে গ্রীস বলে যে দেশ আছে, তার উত্তর অংশে ছিল ম্যাসিডন রাজ্য। সেখানকার রাজা ফিলিপের ইচ্ছা ছিল, পারসিক সাম্রাজ্য দখল করবেন। এই ফিলিপের ছেলে আলেকজাণ্ডার স্বপ্ন দেখতেন আরও বড়—পৃথিবী জয় করার স্বপ্ন। ফিলিপের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি, কিন্তু আলেজাণ্ডার দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকা—এই তিন মহাদেশকে এক সাম্রাজ্যের মধ্যে গাঁথতে পেরেছিলেন।

ভারত আক্রমণ—সৈন্যদের নিয়ে আলেকজাণ্ডার দিগ্‌বিজয়ে বের হলেন। প্রথমে আক্রমণ করলেন পারস্য সাম্রাজ্য। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর ধরে অগ্রসর হয়ে তিনি এশিয়া মাইনরে পারস্য সম্রাটের যত বন্দর ছিল, সব দখল করলেন। তার পর আলেকজাণ্ডার গেলেন মিশরে। মিশর দখল করার পর তিনি পারস্য সম্রাটকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁর রাজধানী পার্সিপোলিস ধ্বংস করলেন। এর পর তিনি কাবুল হয়ে সিন্ধু নদের ধারে এসে পৌঁছালেন। আফগানিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজাদের অনেকে সহজেই আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করলেন; কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করে হেরে গেলেন। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি বিনা যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের অধীনতা মেনে নিলেন। অম্ভিকে সঙ্গে নিয়ে আলেকজাণ্ডার পুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

পুরু—দেশের সম্মান রাখার জন্যে পুরু বীরবিক্রমে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার রাত্রের অন্ধকারে ঝিলম নদী পার হয়ে হঠাৎ আক্রমণ করায় পুরুর সৈন্যরা কিছুটা বেকায়দায় পড়ে গেল। তার উপর বৃষ্টি হওয়ায় মাটি পিছল ছিল বলে পুরুর তীরন্দাজরা মাটিতে ধনুক রেখে তীর ছোঁড়ার সুবিধা করতে পারল না। বিপদের উপর বিপদ, গ্রীকদের তীরের জ্বালায় পুরুর হাতিগুলো নিজেদের দলেরই ক্ষতি করতে লাগল।

পুরু শরীরের নয় জায়গায় আহত হয়েছিলেন, তবু লড়াই ছেড়ে পালাননি। তাঁর সৈন্যেরা যতক্ষণ জোট বেঁধে লড়াই

করেছে ততক্ষণ তিনি যুদ্ধ করতে থাকেন। যখন দেখলেন জয়ের আশা নাই, তখন তিনি তাঁহার হাতির মুখ ঘোরালেন। পুরু যেমন বীর ছিলেন, তেমনি বিশ্বাসী ছিল তাঁর হাতি। পালাবার আগে হাতিটা হাঁটু গেড়ে বসে শুঁড় দিয়ে পুরুর শরীর থেকে সমস্ত তীরগুলো টেনে তুলে ফেলে।

আলেকজাণ্ডারের উদারতা—আলেকজাণ্ডার পুরুর বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তক্ষশিলেশ বলে একজনকে পাঠিয়ে দেন পুরুকে ডেকে আনতে। পুরু তক্ষশিলেশকে তাঁর একজন পুরানো শত্রু বলে চিনতে পেরে, তাঁকে মারতে যান। তক্ষশিলেশ পালিয়ে বাঁচেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তখনও পুরুর উপর রাগ করেননি। পুরুর একজন বন্ধুকে পাঠিয়ে তিনি পুরুকে ফিরিয়ে আনান। আলেকজাণ্ডার নিজে এগিয়ে এসে পুরুকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি দেখলেন, পুরু তখনও মোটেই ভয় পাননি। অতঃপর আলেকজাণ্ডার পুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি আমার কাছে কেমন ব্যবহার চান?" পুরু উত্তর দেন, "রাজার মত।" উত্তর শুনে গ্রীকবীর খুশী হয়ে পুরুকে তাঁর নিজের রাজ্য তো ফিরিয়ে দিলেনই, উপরন্তু সে-রাজ্যের চেয়ে বড় একটা ভূখণ্ডও দান করলেন।

আলেকজাণ্ডারের ইচ্ছা ছিল মগধ জয় করা। কিন্তু তাঁর সৈন্যেরা বিপাশা নদী পর্যন্ত এসে আর এগোতে না চাওয়ায় তিনি দেশের দিকে ফিরলেন। ফেরার পথে পঞ্জাবের উপজাতিরা বার বার আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণে আলেকজাণ্ডারের বিশাল সৈন্যবাহিনী বেশ বিপর্যস্ত হয়। যা হোক, আলেকজাণ্ডার

বেলুচিস্তানের পথ ধরে বাবিলনে ফিরে যান। কিছু দিন পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতের সাধু—আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে এসে শুধু বীরই দেখেননি ; এ দেশের অন্য পরিচয়ও পেয়েছিলেন। আলেকজাণ্ডারের শখ ছিল ভারতের সাধু দেখার। তিনি দণ্ডামি বলে এক ভারতীয় সাধুকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আদেশ পাঠান। দণ্ডামি উত্তর পাঠান, "তোমার কাছে দণ্ডামির কোন দরকার নেই। তোমার যদি জ্ঞানের দরকার থাকে দণ্ডামির কাছে চলে এসো।"

আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়নি। কিন্তু সে সাম্রাজ্য ভারতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায়, তাঁর সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী

১। আলেকজাণ্ডার কোন্ দেশের রাজা ছিলেন? কোন্ কোন্ দেশ জয় করার পর তিনি ভারতে এসেছিলেন?

২। আলেকজাণ্ডারের সময় ভারতের অবস্থা কেমন ছিল?

৩। আলেকজাণ্ডার আর পুরুর যুদ্ধের বর্ণনা কর।

৪। ভারতে আলেকজাণ্ডার বীর ছাড়া আর কি দেখেছিলেন?

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পর, ভারতে একজন অতি পরাক্রমশালী 'চক্রবর্তী' রাজার উদ্ভব হয়। প্রায় সমস্ত ভারত তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল বলে তাঁকে 'চক্রবর্তী' রাজা বলা হয়। এ দেশের প্রাচীন ইতিহাসের যতটুকু নিশ্চিত-ভাবে জানা যায়, তা থেকে মনে হয় তিনিই ছিলেন এ দেশের প্রথম চক্রবর্তী রাজা বা সম্রাট। ভারতের এই প্রথম সম্রাটের নাম ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। আলেকজাণ্ডার যখন পঞ্জাবে, তখন চন্দ্রগুপ্ত নামে এক রাজকুমার নাকি তাঁর শিবিরে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে যান। আলেকজাণ্ডার বা পুরুর কাছে কোন রাজপুত্রের যুদ্ধ-কৌশল শিখতে আসা অসম্ভব নয়; তবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না। তবে এইটুকু নিশ্চিত যে, চন্দ্রগুপ্ত এক সময়ে পঞ্জাবে নির্বাসনে ছিলেন, আর তাঁকে সৈন্য সংগ্রহ করে মগধের সিংহাসন অধিকার করতে হয়েছিল।

বংশ-পরিচয়—হিন্দুদের পুরাণে আছে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধরাজ মহাপদ্ম নন্দের ছেলে; তাঁর শূদ্রাণী মায়ের নাম ছিল মুরা; মায়ের মুরা নাম থেকেই তাঁর মৌর্য উপাধি। বৌদ্ধদের গ্রন্থে লেখা আছে, চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের কোন এক ছোটখাটো রাজার ছেলে। গ্রীক ঐতিহাসিকরা বলেন, চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন নীচ বংশের ছেলে। আর একটি

কাহিনীতে আছে, চন্দ্রগুপ্ত "ময়ূর-পোষক"দের (ময়ূর পালক) এক গ্রামের মাতব্বরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর বংশের উপাধি হয়েছিল মৌর্য। সে যা হোক, এটা ঠিক যে, চাণক্য বা কৌটিল্য নামে এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে তিনি নন্দ রাজাকে পরাস্ত করে মগধের সিংহাসনে বসেন।

রাজ্য-বিস্তার—চন্দ্রগুপ্ত অতি বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তিনি সিন্ধু উপত্যকা থেকে গ্রীকদের তাড়িয়ে দেন। তারপর তিনি মগধ অধিকার করেন। এখন যেটা বিহার রাজ্য, তারই একটা অংশকে সেকালে বলা হত মগধ। তিনি ক্রমশ সারা উত্তর ভারত জয় করেন। দক্ষিণ ভারতেও তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। গ্রীক সেনাপতি সেলুকস তাঁর ভারতবর্ষের রাজ্য ফিরে পাবার জন্যে ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি চন্দ্রগুপ্তকে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এইভাবে ভারতে চন্দ্রগুপ্তের এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

মেগাস্থিনিস—সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র (এখনকার পাটনা) শহরে একজন দূত পাঠান। এই গ্রীক দূতের নাম ছিল মেগাস্থিনিস।

মেগাস্থিনিসের বিবরণী—মেগাস্থিনিস এদেশে থাকার সময় যা যা দেখেছিলেন, শুনেছিলেন—সব লিখে রেখেছিলেন। কী লিখেছিলেন তিনি, সব জানা যায় না; কারণ তাঁর লেখাগুলো অনেককাল হারিয়ে গিয়েছে। তবে তাঁর

বিবরণী দেখে গ্রীসের অন্য লেখকরা যা লিখেছিলেন, সেগুলো পাওয়া যায়।

পাটলিপুত্র—মেগাস্থিনিসের বিবরণী থেকে জানা যায়: চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল বিশাল শহর। শহরটা লম্বায় ছিল প্রায় নয় মাইল আর চওড়ায় দেড় মাইল। শহরের চার পাশে ছিল কাঠের পাঁচিল। পাঁচিলের পায়ে তীরন্দাজদের তীর ছোঁড়ার জন্য অনেক ছিদ্র ছিল। ঐ পাঁচিলে ছিল পাঁচ শ সত্তরটা গম্বুজ আর চৌষট্টিটা তোরণ। পাঁচিলের ঠিক বাইরে ছিল ছয় শ ফুট চওড়া একটা পরিখা। পরিখায় জল ভরা থাকত।

রাজা ও রাজবাড়ি—রাজা তাঁর প্রাসাদের মধ্যে বাস করতেন। তিনি যে প্রাসাদে বাস করতেন তা ছিল পারস্য সম্রাটের রাজবাড়ির চেয়ে জাঁকাল। বাড়িটা ছিল কাঠের তৈরী। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভাও খুব জাঁকাল ছিল। রাজা সোনার জরি দেওয়া পোশাক পরে রাজসভায় বসতেন। তাঁর শখ ছিল, শিকার করার আর পশু-পাখির লড়াই দেখার।

চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদল—মৌর্য সম্রাটের মাইনে-করা সৈন্য ছিল। ছয় লক্ষ পদাতিক, তিন লক্ষ ঘোড়সওয়ার এবং বহু যুদ্ধের হাতি আর রথ ছিল তাঁর।

শাসন-ব্যবস্থা—রাজা নিজেই বিচার করতেন। দূরের রাজ্যগুলো নিজে দেখতেন না বলে সেগুলোতে তিনি তাঁর প্রতিনিধি পাঠাতেন। চন্দ্রগুপ্তের শাসনগুণে দেশে শান্তি ছিল ও চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। চন্দ্রগুপ্তের সময়

দেশে চাষের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়েছিল। প্রজারা রাজাকে তাদের ফসলের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব দিত।

অর্থশাস্ত্র—চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। 'অর্থশাস্ত্র' বলে তিনি একখানা বই লিখে যান। তাঁর অর্থশাস্ত্রে মৌর্যদের সময়কার অনেক কথা লেখা আছে। সে যুগের রাজারা কি ভাবে দেশ শাসন করতেন, তা এই বই থেকে জানা যায়।

এখনকার পাটনার সামান্য দূরে মাটি খুঁড়ে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।

অনুশীলনী

১। চন্দ্রগুপ্ত কে ছিলেন? তাঁর প্রথম জীবন সম্বন্ধে কি জান? তাঁর বংশকে মৌর্যবংশ বলে কেন?

২। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী কোথায় ছিল? তার বর্ণনা দাও।

৩। মেগাস্থিনিস কে ছিলেন? তিনি এ দেশ সম্বন্ধে কি লিখে গিয়েছেন?

৪। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীর সম্বন্ধে কি জান? তিনি কি বই লিখে গিয়েছেন?

সম্রাট অশোক

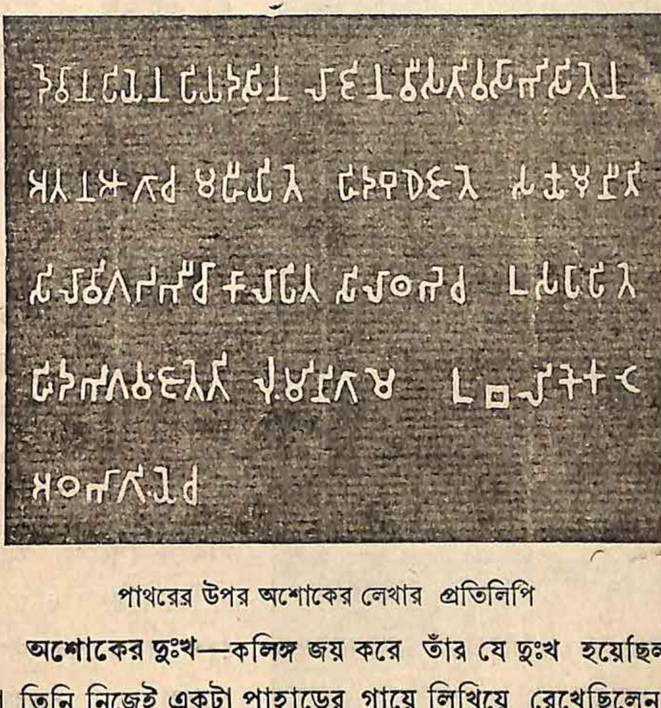
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পর মগধের সিংহাসনে বসেন তাঁহার ছেলে বিন্দুসার। বিন্দুসারের মেজো ছেলে ছিলেন অশোক। কিন্তু বিন্দুসারের মৃত্যুর পর, অশোকই সিংহাসন দখল করেন। তার জন্যে তাঁকে হয়তো ভাইদের সঙ্গে বিবাদ করতে হয়েছিল।



অশোক

কলিঙ্গ-বিজয়—রাজা হয়েই অশোক পিতামহের মত রাজ্য বিস্তারে মন দেন; তাই তিনি কলিঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। এখনকার অন্ধ্র ও উড়িষ্যার একটা অংশ ছিল সেকালের

কলিঙ্গ। কলিঙ্গ দেশ তিনি জয় করলেন বটে কিন্তু জয় করে মনে ব্যথাই পেলেন। লক্ষ লক্ষ লোক মেরে, লক্ষ লক্ষ লোককে ঘরছাড়া করে দেশ জয় করা সুখের নয়, তা তিনি বুঝলেন।



পাথরের উপর অশোকের লেখার প্রতিলিপি

অশোকের দুঃখ—কলিঙ্গ জয় করে তাঁর যে দুঃখ হয়েছিল, তা তিনি নিজেই একটা পাহাড়ের গায়ে লিখিয়ে রেখেছিলেন। সে লেখা এখনও আছে। তিনি লিখিয়েছিলেন, লড়াই করে দেশজয় তিনি আর করবেন না ; এখন থেকে তাঁর লক্ষ্য, জগতে শান্তি আনা, ধর্মরাজ্য স্থাপন করা।

কলিঙ্গ জয়ের পর অশোক উপগুপ্ত বলে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নেন। বৌদ্ধ হয়ে প্রথম দিকে তিনি সাধারণ গৃহী

বৌদ্ধের মত থাকতেন, পরে বৌদ্ধ সংঘে ঢোকেন। সন্ন্যাসী থেকেও যে রাজত্ব করা যায়, রামায়ণের রাজা জনকের মত ভারতের প্রাচীন রাজারা এটা আগেই দেখিয়ে গিয়েছিলেন। অশোক তাঁদের পথ ধরলেন।



অশোক-স্তম্ভের সিংহমূর্তি

বৌদ্ধধর্ম প্রচার—অশোক নিজেই শুধু বৌদ্ধ হলেন না ; বুদ্ধের অহিংস ধর্ম প্রচারের জন্যে তিনি দেশ-বিদেশে দূত পাঠালেন। দক্ষিণে সিংহল আর পশ্চিমে মিশর ও গ্রীস দেশ পর্যন্ত গেল তাঁর দূতেরা। সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশ ও সুমাত্রাতেও তাঁর দূত গিয়েছিল। তাঁর চেষ্টায় গৌতম বুদ্ধের ধর্ম পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। স্বদেশে তিনি বুদ্ধের অনেক

সহজে সরল কথা পাহাড়ের গায়ে খোদাই করিয়েছিলেন। লোককেও ধর্ম শেখানোর জন্য বড় বড় থাম তৈরি করিয়ে সেগুলোর উপর তিনি লিখিয়েছিলেন বুদ্ধের কত উপদেশ। প্রজাদের ধর্ম-শিক্ষার দিকে নজর রাখবার জন্যে তিনি অনেক কর্মচারীও রেখেছিলেন।

প্রজার হিত-সাধন—অশোক প্রজাদের শুধু ভালো ভালো উপদেশ শোনানোরই ব্যবস্থা করেননি, প্রজাদের সব রকম মঙ্গলের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি অনেক রাজপথ তৈরি করিয়ে দেন; অসংখ্য কুয়ো খোঁড়ান; মানুষের জন্য, পশুর জন্যও চিকিৎসালয় খোলেন। দুঃস্থ লোকদের জন্য অন্নাদি দানেরও ব্যবস্থা তিনি করে দেন।

অশোক প্রজাদের সন্তানের মত দেখতেন। তিনি মনে করতেন, প্রজাদের হিত করে তিনি তাদের ধার শোধ করছেন মাত্র। তাঁর রাজপুরুষদের তিনি মনে করিয়ে দিতেন যে প্রজার কল্যাণের জন্যেই তাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন। "ধাই-মা যেমন শিশুর দেখাশোনা করে, তাঁদের উচিত, তেমনি করে প্রজাদের মঙ্গল দেখা।"

চন্দ্রগুপ্তের সময় অপরাধীদের শাস্তি ছিল খুব কড়া, খুব নিষ্ঠুর; অশোক তাদের দণ্ড লঘু করার চেষ্টা করেন।

প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করার পর অশোক মারা যায় অশোকের আগে বা অশোকের পরে এত বড় মহাপুরুষ রাজা পৃথিবীর কোথাও হয়েছেন বলে জানা যায় না।

অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব—অর্থশাস্ত্রে আছে : "সর্বজনের সেবাই হচ্ছে রাজার ধর্ম ; কর্তব্য করলেই তাঁর যজ্ঞ করা হয়।" প্রাচীন ভারতের রাজারা এ আদর্শ মেনে চলতেন। সম্রাট অশোক যেন এই আদর্শের প্রতিমূর্তি ছিলেন। তিনি বলতেন, প্রজারা আমার সন্তান ; শুধু বলতেন না, কাজেও তা দেখিয়ে গিয়েছেন। এই জন্য ইতিহাসে অশোককে বড় রাজা বলে। কিন্তু শুধু এজন্যই নয়—কোন দেশে কোন কালে অশোকের মত একজন শক্তিমান সম্রাট যুদ্ধ করে দেশ জয় করার চেয়ে ভালোবেসে দেশ জয় করার আদর্শ গ্রহণ করেননি অশোকই একমাত্র রাজা, যিনি তা করে গেছেন। তাই অশোককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা যায়।

অনুশীলনী

১। সম্রাট অশোকের কলিঙ্গজয় বর্ণনা কর।

২। অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য কি কি করেছিলেন ?

৩। সম্রাট অশোক প্রজাদের কি চক্ষে দেখতেন ? তাদের হিতের জন্য কি কি করেছিলেন ?

৪। অশোক পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্রাট কেন ?

গুপ্তবংশ ঃ সমুদ্রগুপ্ত

অশোকের পর মৌর্য সাম্রাজ্য বেশী দিন টেকেনি। অনেকে বলেন, অশোক দেশে যে শান্তি ও অহিংসার মন্ত্র প্রচার করেছিলেন, তার ফলে লোকে যুদ্ধ করা ভুলে গিয়েছিল। অশোকের পর মৌর্যবংশের যে সব রাজা ছিলেন, তাঁদের সাম্রাজ্য রক্ষা করার শক্তি ছিল না। মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্‌-রথকে সরিয়ে তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র মগধের সিংহাসন অধিকার করলেন।

পুষ্যমিত্র শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শুঙ্গ রাজাদের সময়ে বিদেশীরা ভারত আক্রমণ করতে থাকে। প্রথমে আসে এশিয়াবাসী গ্রীকরা। তারা মধ্য ভারতের প্রায় সবটা দখল করে নেয়। তারা পাটলিপুত্র পর্যন্ত এগিয়েছিল বলে জানা যায়, তবে দখল করতে পারেনি। তাদের পর, মধ্য এশিয়া ও ইরান থেকে শক, পহ্লব আর কুষাণরা পর পর উত্তর-পশ্চিম ভারতে এসে রাজত্ব করেছিল। এই সব জাতি কালক্রমে এদেশীয় হয়ে ভারতের সমাজে মিশে গিয়েছে। এই বিদেশীদের ভারতে এসে রাজত্ব করার পালা শেষ হয় সমুদ্রগুপ্তের সময়ে।

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা—সমুদ্রগুপ্তের বাবা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। ইনি মগধে রাজত্ব করতেন। এঁর সময়েই গুপ্ত-

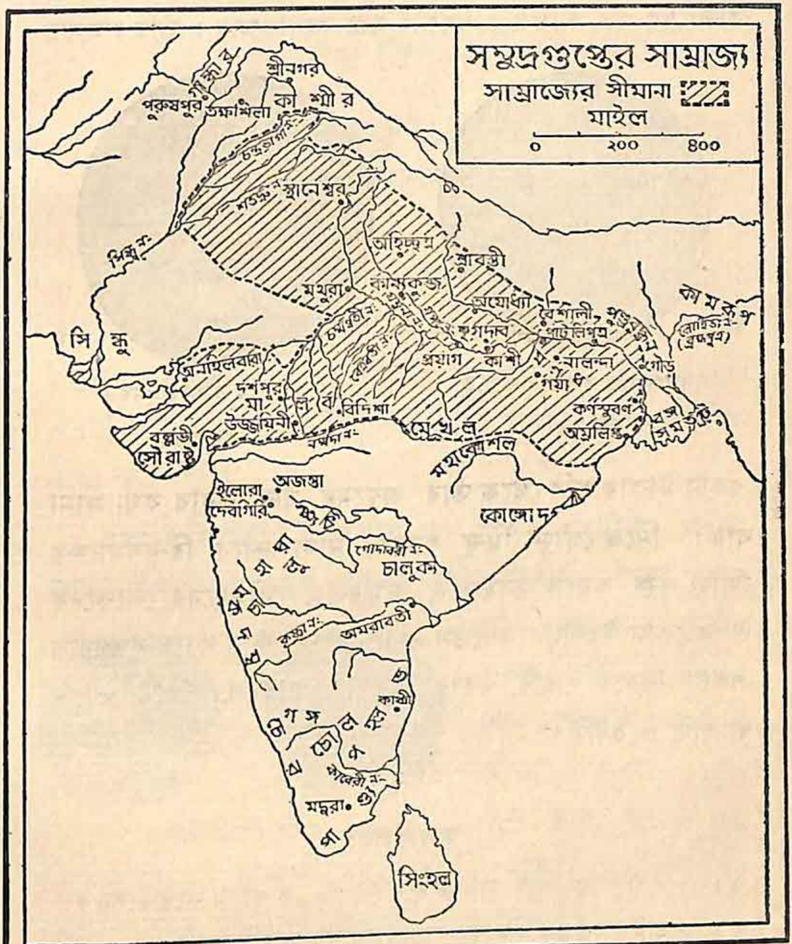
বংশের খ্যাতি ও শক্তিবৃদ্ধি হয়। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্তবংশের লোক। ইনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশের লোক ছিলেন না।

চন্দ্রগুপ্তের সময় মগধ রাজ্য ছিল ছোট। মগধের পাশেই ছিল লিচ্ছবি রাজ্য। এই লিচ্ছবি রাজ্যের এক ক্ষত্রিয়কন্যাকে বিয়ে করে চন্দ্রগুপ্তের ভাগ্য খুলে যায়। তিনি প্রয়াগ ও অযোধ্যা পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য—গুপ্তবংশের রাজা চন্দ্রগুপ্তের ছেলে হলেন সমুদ্রগুপ্ত। সমুগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ অশোকের তৈরী একটি থামের নীচে সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে সংস্কৃত শ্লোকে অনেক কথাই লিখে গিয়েছেন। তা থেকে আমরা জানতে পারি, সমুদ্রগুপ্ত বাহুবলে উত্তর, পূর্ব আর পশ্চিম দেশের রাজাদের পরাজিত করেন। তিনি সমস্ত দেশটাকে এক করার জন্যে দিগ্‌বিজয়ে বের হন। উত্তর ভারতের রাজাদের তিনি উচ্ছেদ করেন। দক্ষিণ ভারতের রাজারা তাঁর বশ মানলেই তিনি তাঁদের রাজ্য তাঁদের হাতে ফিরিয়ে দেন। এইভাবে তাঁর যে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, তা পশ্চিমে যমুনা আর চম্বল নদী থেকে পূর্বে বাংলা দেশ পর্যন্ত এবং উত্তরে নেপাল থেকে দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এই এলাকার বাইরের রাজারাও তাঁকে মেনে চলতেন; অনেকে করও দিতেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্মণও সমুদ্রগুপ্তকে সম্রাট বলে মেনে নিয়েছিলেন। সম্রাট অশোকের পর সমুদ্রগুপ্তই ভারতের সব চেয়ে বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

গুণী সম্রাট—সমুদ্রগুপ্ত শুধু বড় বীরই ছিলেন না; তাঁর অনেক গুণও ছিল। হরিষেণের কথায়, সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন

দেবরাজ ইন্দ্রের গুরু বৃহস্পতির চেয়েও বিদ্যাবুদ্ধিতে বড়, সঙ্গীতে নারদমুনির চেয়েও বড়। সমুদ্রগুপ্তের সময়কার কিছু টাকা পাওয়া



গিয়েছে ; একটা টাকায় ছবি আছে ঃ সমুদ্রগুপ্ত বীণা বাজাচ্ছেন। তিনি নাকি ভালো কবিও ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের ধর্ম—গুপ্তবংশের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লোক—অর্থাৎ হিন্দু। মহাকাব্যের যুগের দিগ্‌বিজয়ী রাজাদের মত সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর সময়ের



সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞের স্মারক মুদ্রা



মুদ্রা : বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্ত

একটা টাকার ছবি থেকে তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞ করার কথা জানা যায়। নিজে গোঁড়া হিন্দু হলেও, নানা ভাবে হিন্দুসমাজের ভিত্তি শক্ত করতে চাইলেও, সমুদ্রগুপ্ত বৌদ্ধধর্মের লোকদের উপর কোন উৎপীড়ন করতেন না। বৌদ্ধরা তাঁর কাছে বুদ্ধগয়ায় একটা বিহার তৈরি করার অনুমতি চাইলে, তিনি তাতে আপত্তি করেননি।

অনুশীলনী

১। গুপ্তবংশ কি ভাবে স্থাপিত হয়েছিল? কে স্থাপন করেছিলেন?

২। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন?

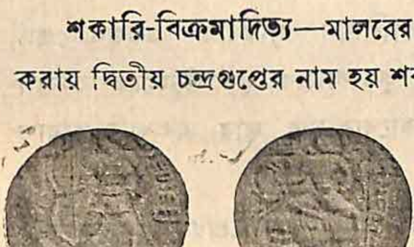
৩। সমুদ্রগুপ্ত কোন্ ধর্মের লোক ছিলেন? তিনি কোন্ যজ্ঞ করেছিলেন তাঁর কি কি গুণ ছিল?

চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য

কালিদাস ঃ ফা-হিয়েনের বিবরণ ঃ ভারতের গৌরবময় যুগ

বিদেশী শক ও কুষাণরা সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, তাই তিনি তাদের রাজ্য অধিকার করেননি। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর শক জাতি আবার মাথা তুলবার চেষ্টা করায় সমুদ্রগুপ্তের ছেলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাদের চিরদিনের মত ঠাণ্ডা করে দেন।

শকারি-বিক্রমাদিত্য—মালবের শক রাজাকে পরাস্ত করায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নাম হয় শকারি অর্থাৎ শকদের শত্রু। তাঁর রাজ্য আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর প্রতাপ সব রাজাই স্বীকার করে নিত বলে তাঁর উপাধি হয় বিক্রমাদিত্য। আদিত্য মানে সূর্য; সুর্যের প্রতাপ যেমন পৃথিবীর সর্বত্র, চন্দ্রগুপ্তের প্রতাপও ছিল তেমনি।



চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা

বিক্রমাদিত্যের রাজধানী—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল কখনও পাটলিপুত্রে, কখনও অযোধ্যায়। প্রবাদ আছে,

বিক্রমাদিত্য ছিলেন উজ্জয়িনীর রাজা। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও পাটলিপুত্র আর উজ্জয়িনীর রাজা বলে বিখ্যাত ছিলেন। এই উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক গল্প চলিত আছে।

নবরত্নসভা—চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য শুধু বীর ছিলেন না, নিজে তিনি গুণী ছিলেন, তাই গুণীর আদর জানতেন। তাঁর রাজসভায় নাকি তখনকার দিনের ভারতের নয়জন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের বলা হত নবরত্ন। কবি কালিদাস, জ্যোতির্বিদ বরাহ-মিহির, অভিধানকার অমর সিংহ প্রভৃতিকে নিয়ে ছিল এই নবরত্নের সভা।

কবি কালিদাস

কালিদাসের কাব্য—কালিদাস পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব খুব উঁচুদরের কাব্য। বিশেষ করে, তাঁর মেঘদূত কাব্যের মত আর একখানি কাব্যও পৃথিবীতে নাই।

রঘুবংশে আছে (রামায়ণের) রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রঘুর বংশের কীর্তি-কথা; কুমারসম্ভব কাব্যে আছে শিবের জন্যে পার্বতীর তপস্যা আর কুমার কার্তিকেয়র জন্মকাহিনী। মেঘদূত, কাব্যে আছে দেশের রাজা এক যক্ষকে নির্বাসন দিয়েছে, আষাঢ়ের মেঘ দেখে যক্ষের মন বাড়ির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে; সে মেঘকে বলছে, আমার বাড়িতে গিয়ে সব খবর নিয়ে এসো।

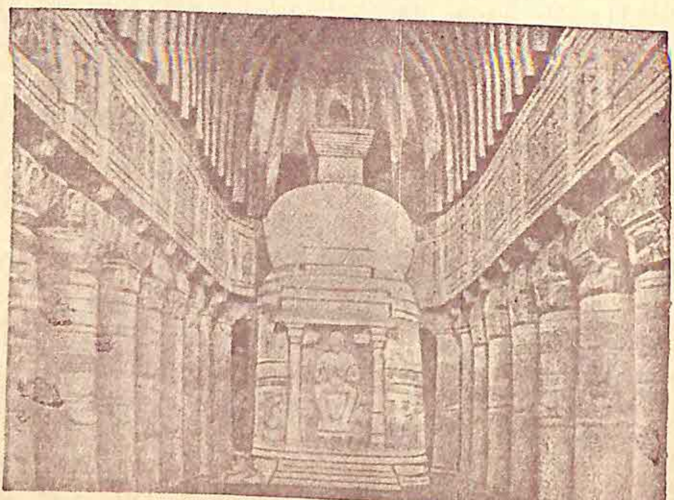


অজন্তার চিত্র : হাতীর লড়াই





অজন্তার চিত্র : শোভাযাত্রায় রাজা



অজন্তা : চৈত্য গৃহ

শকুন্তলা নাটক—কাব্য ছাড়া কালিদাস নাটকও লিখেছিলেন—বিক্রমোর্বশী, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ তাঁর অপূর্ব কীর্তি। এই নাটকে রাজসভার জাঁকজমকের পাশে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন মুনিদের আশ্রমের ছবি—সেখানে গাছপালা, পশু-পাখির সঙ্গে মানুষের কি সুন্দর আত্মীয়তা!

কালিদাসের পরিচয়—কালিদাস শুধু মহাকবি ছিলেন না; তিনি জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রেও বেশ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাব্য-নাটকে তার পরিচয় আছে। কোথায় তাঁর বাড়ি ছিল, কেউ জানে না; তবে উত্তর ভারতের কোথাও, এটা ঠিক। অনেকে বলেন, মালব রাজ্যের মান্দাসোরেই ছিল কালিদাসের বাড়ি।

ফা-হিয়েনের বিবরণ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে, আজ থেকে দেড় হাজারেরও বেশী বৎসর আগে, ফা-হিয়েন নামে একজন চীনা ভিক্ষু বৌদ্ধধর্মের নিয়ম-কানুনের খোঁজে চীন থেকে ভারতে আসেন। তিনি এদেশে কয়েক বৎসর ছিলেন—সারা উত্তর ভারত ঘুরে তিনি বাংলা দেশে আসেন; এখান থেকে জাহাজে চড়ে নিজের দেশে ফেরেন। ভারতে তিনি যা দেখেছিলেন, লিখে রেখেছিলেন। তাঁর বিবরণে পাওয়া যায়, তখন পাটলিপুত্র নগরে অশোকের তৈরী পাথরের রাজপ্রাসাদটি ছিল। দেশের সর্বত্র বৌদ্ধদের মঠ ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ তীর্থগুলোয় তেমন ভিড় ছিল না। বৌদ্ধমঠ ছাড়া রাজ্যের নানা জায়গায় দাতব্য প্রতিষ্ঠান, পান্থশালা

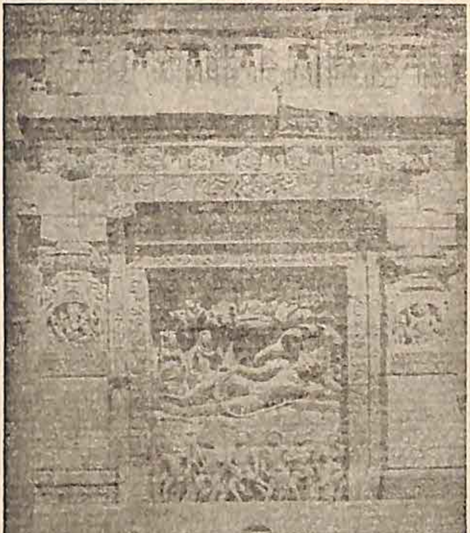
প্রভৃতিও ছিল। পাটলিপুত্র আর তাম্রলিপ্ত (বাংলা দেশের তমলুক) শহর ছিল বিদ্যাচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। দেশের অবস্থা খুবই ভাল ছিল; প্রজাদের উপর খাজনার চাপ ছিল না। জিনিসপত্তর বেশ সস্তা ছিল। রাজ্যের মধ্যে কোন রকম উৎপাত ছিল না। মৌর্যদের সময়কার মত, কোন নগরে ঢুকবার বা নগর থেকে বেরোবার সময় ছাড়পত্র দেখাতে হত না। সাধারণ অপরাধের জন্য শুধু জরিমানা হত, তবে রাজদ্রোহ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ করলে অপরাধীর হাত-পা কেটে দেওয়া হত। দেশের লোকে মদ-মাংস খেত খুব কম; পেঁয়াজ-রশুনও কম খেত। গুপ্ত সম্রাটদের নৌবলের কথাও ফা-হিয়েন বলেছেন। সিংহল, মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এ দেশের সাগরপথে বাণিজ্য চলত।

ভারতের গৌরবময় যুগ

গুপ্ত রাজাদের আগে থেকেই, বিদেশী পহ্লব ও কুষাণ রাজাদের সময় হতেই, ভারতে একটা নতুন জীবনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। বিদেশীদের সঙ্গে মিলে-মিশে এ দেশের লোকের মানসিক জড়তা ক্রমেই কেটে যাচ্ছিল। বিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটার ফলে এ দেশের শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে ধর্মে—সকল বিষয়ে—একটা নতুন জীবন দেখা দিল।

ধর্ম—গুপ্তযুগে হিন্দুধর্ম আর বৌদ্ধধর্ম—দুই-ই পাশাপাশি চলত। ফা-হিয়েন বলেছেন, "ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের নিমন্ত্রণ

দেয়।” হিন্দু আর বৌদ্ধ দুই ধর্মের লোকের মধ্যে ভাবের দেওয়া-নেওয়া চলত। হিন্দুরা তখন বৈদিক যাগযজ্ঞের বেশী ভক্ত ছিল বলে মনে হয় না। বৌদ্ধ হোক, হিন্দু হোক, দেশের লোকে মাছ-মাংস কমই খেত। তা থেকে বোঝা



পাথরের উৎকীর্ণ অনন্তশায়ী বিষ্ণু (দেওগড়ে প্রাপ্ত)

যায়, সকলেই অহিংসায় বিশ্বাস করত। বৌদ্ধরা সে যুগে বুদ্ধের মূর্তি গড়তে শুরু করেছিল—রথে করে বুদ্ধের শোভাযাত্রা বেরোত। হিন্দুরাও মূর্তি গড়ে দেবদেবীর পূজো আরম্ভ করেছিল ; তাদের পূজোর মধ্যে আগেকার মত কেবল

শুকনো অনুষ্ঠান ছিল না। ভক্তিভরে পূজো করার রীতি ক্রমেই এসে যাচ্ছিল।

চিত্র ও মূর্তি শিল্প—গুপ্তযুগে নানা রকম শিল্পের ভিতর দিয়ে মানুষ তার নতুন ভাবের পরিচয় দিচ্ছিল। অজন্তার বিখ্যাত গুহা-চিত্রগুলো ঐ যুগের। এগুলো সারা এশিয়ার



অজন্তার চিত্র : বানর মূর্তি

চিত্রকলার উপর কমবেশী প্রভাব রেখে গেছে। শুধু চিত্রকলা নয়, পাথরের মূর্তি তৈরীতেও সে যুগের লোক দক্ষ হয়ে উঠেছিল। মথুরার বুদ্ধমূর্তি এই যুগের। এত সুন্দর মূর্তি পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। শুধু বুদ্ধমূর্তি নয়, এ-যুগের হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিগুলিও অপূর্ব সুন্দর। দেওগড়ের

নর-নারায়ণের মূর্তির মত বহু সুন্দর সুন্দর মূর্তিই এই সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

সাহিত্য—গুপ্তযুগে শিল্পের মত সাহিত্যেরও চরম উন্নতি হয়েছিল। কালিদাস ছিলেন এই যুগের মানুষ। তাঁর কথা বলা হয়েছে। কালিদাস ছাড়া আরও অনেকে সে যুগে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' ও বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস'-এর নাম করা যেতে পারে। মৃচ্ছকটিকে সে যুগের শহুরে জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। মুদ্রারাক্ষসে সে যুগের রাজনীতির কথা আছে—চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত কেমন করে নিজের রাজত্ব পাকা করলেন, তার কাহিনী।

জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র—এ যুগে বিজ্ঞানেরও অসাধারণ উন্নতি হয়েছিল। বরাহ-মিহির ছিলেন বিক্রমাদিত্যের সভার এক রত্ন। জ্যোতির্বিদ্যায় এবং অঙ্কশাস্ত্রে আর্যভট্টের পর তাঁরই নাম করতে হয়। এ জ্যোতির্বিদ্যায় অনেক গ্রন্থই আর্যভট্ট, বরাহ-মিহির আর ব্রহ্মগুপ্তের লেখা। এঁদের লেখা বই থেকে জানা যায় যে, এঁরা গ্রীকদের কাছ থেকে এই বিদ্যার কিছু কিছু নতুন কথা শিখে নিয়েছিলেন।

চিকিৎসা—জ্যোতিষ ছাড়া চিকিৎসা শাস্ত্রের খুব উন্নতি হয়েছিল এই সময়। সে যুগের কবিরাজরা অস্ত্র-চিকিৎসাতেও বেশ দক্ষ ছিলেন। পশুর দেহ কেটে অস্ত্র-চিকিৎসা শেখানো হত। মোমের তৈরী মানুষের উপর ছুরি চালিয়েও ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার রীতি ছিল। ভারতের লোক গ্রীকদের কাছে

থেকে যেমন জ্যোতিষের পাঠ নিয়েছিল, তেমনি গ্রীকরা আর আরবরা এ দেশের লোকের কাছে চিকিৎসাবিদ্যা শিখে যায়।

সত্যই সব দিকে থেকেই গুপ্তযুগ ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা অসাধারণ যুগ।

অনুশীলনী

১। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে বিক্রমাদিত্য বলা হয় কেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

২। কবি কালিদাস সম্বন্ধে কি জান?

৩। ফা-হিয়েন কে ছিলেন? তিনি ভারতের সম্বন্ধে কি লিখেছেন?

৪। গুপ্তযুগকে ভারতের স্বর্ণযুগ বলে কেন?

সম্রাট হর্ষবর্ধন

হিউয়েন সাঙের বিবরণ ঃ নালন্দার কাহিনী

গুপ্ত সম্রাট বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর থেকেই হূন বলে মধ্য এশিয়ার একটা অসভ্য জাতি বারবার গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে থাকে। ফলে, গুপ্ত সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। এই সময় মালব, কনৌজ আর থানেশ্বরের রাজারা হূনদের যুদ্ধে পরাস্ত করে ভারতের মধ্যে বেশ প্রবল হয়ে ওঠেন।



হর্ষবর্ধন

থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের ছিল দুই ছেলে—রাজ্যবর্ধন আর হর্ষবর্ধন, এবং এক মেয়ে—রাজ্যশ্রী। রাজ্যশ্রীর বিয়ে হয়েছিল কনৌজের রাজা গ্রহবর্মণের সঙ্গে। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর, রাজ্যবর্ধন রাজা হয়েই শুনলেন, মালবের রাজা দেবগুপ্ত কনৌজ দখল করেছেন, গ্রহবর্মণকে মেরে ফেলেছেন, আর রাজ্যশ্রীকে বন্দী করেছেন। এই দুঃসংবাদ শুনে রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন ; দেবগুপ্তকে

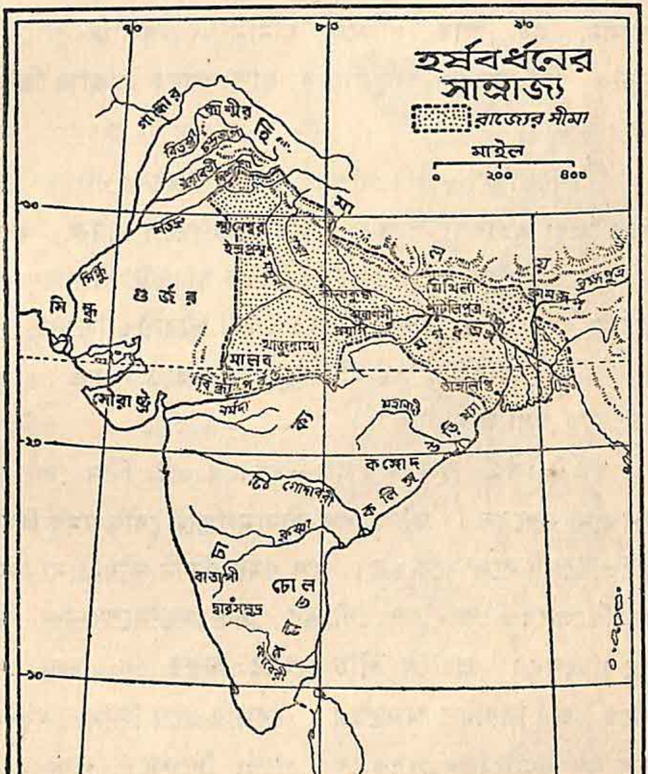
যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তিনি বোন রাজ্যশ্রীকে মুক্তি দেবার জন্যে কনৌজ যাচ্ছিলেন ; পথে দেবগুপ্তের বন্ধু গৌড় দেশের (পশ্চিম ও উত্তর বাংলার) রাজা শশাঙ্ক তাঁকে হত্যা করলেন।

রাজ্যবর্ধনের পর হর্ষবর্ধন রাজা হলেন। রাজা হয়েই তিনি শশাঙ্ককে শাস্তি দিতে ছুটলেন, পথে বোন রাজ্যশ্রী নিখোঁজ হয়েছেন শুনে তাঁর খোঁজে বিন্ধ্যপর্বতে যান এবং রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। তারপর, কনৌজের অমাত্যদের অনুরোধে তিনি বোনের সঙ্গে যুক্তভাবে কনৌজে রাজ্যের শাসনভারও নিলেন। কালক্রমে কনৌজই হর্ষবর্ধনের প্রধান রাজধানী হয়ে যায়। দেবগুপ্তকে পরাস্ত করে হর্ষবর্ধন চললেন দেবগুপ্তের বন্ধু বাংলার রাজা শশাঙ্ককে শাসন করতে।

শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধ—এখানকার আসাম রাজ্যে সেকালে কামরূপ বলে একটা রাজ্য ছিল। কামরূপের রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করলেন। শশাঙ্কের রাজ্যের কিছু অংশ হর্ষবর্ধন কিছুদিন দখলে রেখেছিলেন বলে মনে হয়। শশাঙ্ককে কিন্তু তিনি কোনদিনই দমন করতে পারেননি। মৃত্যুর আগে শশাঙ্ক যে গৌড়, মগধ, বুদ্ধগয়া ও উৎকলের রাজা ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজ্য বিস্তার—হর্ষবর্ধনের অধীনে থানেশ্বর আর কনৌজ রাজ্য মিলে যাওয়ায় তাঁর রাজ্য এমনিতেই বেশ বড় হয়ে উঠেছিল। তার উপর নিজের বাহুবলে তিনি উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজাকেই বশে আনেন। মগধ আর উড়িষ্যা কোন সময়ে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই

ভাবে, পূর্ব পঞ্জাব থেকে বিহার উড়িষ্যা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। সাম্রাজ্যের বাইরে বলভী আর কামরূপের রাজারাও



তাঁর বশ্যতা মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর শত্রুরাও হর্ষবর্ধনকে উত্তর ভারতের সম্রাট বলে স্বীকার করতেন।

হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারতের দিকেও এগোবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে তিনি যুদ্ধে হেরে যান। দ্বিতীয় পুলকেশী যতদিন জীবিত ছিলেন, হর্ষ আর দক্ষিণে যাননি। দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন চালুক্যদের হাত থেকে গঞ্জাম ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

বিদ্যালোচনা—কবি পণ্ডিত বলে হর্ষবর্ধনের খ্যাতি ছিল। তাঁর লেখা 'রত্নাবলী' সংস্কৃত ভাষার একটি ভাল নাটক। সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'কাদম্বরী'র লেখক বাণভট্ট তাঁর বন্ধু আর সভাকবি ছিলেন। বাণভট্ট হর্ষের একটা জীবনীও লিখেছিলেন। তার নাম 'হর্ষচরিত'। এই বই থেকে হর্ষ সম্বন্ধে অনেক চমৎকার চমৎকার কথা জানা যায়।

ধর্ম—শিব, সূর্য আর বুদ্ধ—হর্ষবর্ধন এই তিন দেবতারই উপাসনা করতেন। তবে, শেষ জীবনে তিনি বৌদ্ধধর্মের দিকেই ঝুঁকেছিলেন বলে মনে হয়। সে সময়, তিনি জীবহিংসা ত্যাগ করেছিলেন। কনৌজে বৌদ্ধের এক মহাসম্মেলনও তিনি ডেকেছিলেন। প্রয়াগে পাঁচ বৎসর অন্তর যে মেলা বসত, তাতে তিনি নিয়মিত আসতেন। মেলায় এসে তিনি শিব, সূর্য আর বুদ্ধ—এই তিন দেবতাকেই পুজো দিতেন। পাঁচ বৎসর রাজভাণ্ডারে যত ধনদৌলত জমা হত, তার সব কিছুই তিনি এই মেলায় এসে দান করতেন। সব ধর্মের লোকই দান পেত। দান শেষ হলে একখানা সাধারণ কাপড় পরে তিনি বুদ্ধের পাদবন্দনা করতেন।

হিউয়েন সাঙের ভারত-বিবরণ

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ নামে একজন চীনা পরিব্রাজক বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করতে ভারতে আসেন। প্রায় চৌদ্দ বৎসর তিনি এ দেশে ছিলেন। নেপাল থেকে সিংহল পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ দেখে তিনি এ দেশের একটা বিবরণী লেখেন। তাঁর বিবরণী থেকে হর্ষের যুগের ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।



হিউয়েন সাঙ

দেশের অবস্থা—হিউয়েন সাঙ লিখেছেন: বিদেশীর আক্রমণে শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি অনেক পুরানো শহর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কাশী, কনৌজ প্রভৃতি শহর কিন্তু আরও বড় হয়ে উঠেছে।

ভারতের সর্বত্রই সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা খুব সহজ ও সরল; কিন্তু ধনীদের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদের আর অলঙ্কারের বেশ আড়ম্বর দেখা

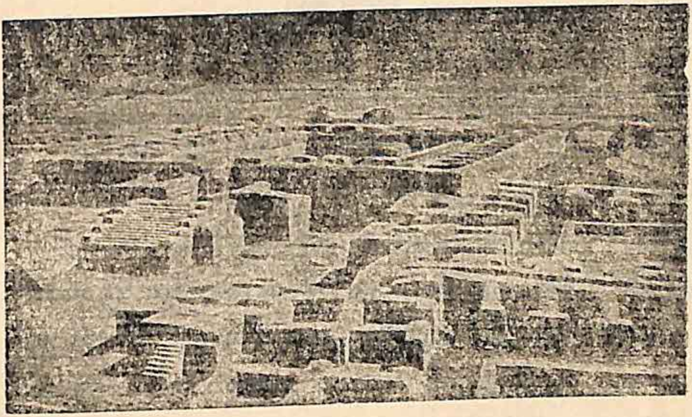
যায়। চাষবাসের অবস্থা বেশ ভাল; তবে উত্তর ভারতে চোর-ডাকাতের কিছু উপদ্রব আছে। তাহলে অপরাধীদের সংখ্যা বেশী নয়। সাধারণ লোক শান্তিপ্রিয়, তাহাদের খুব ধর্মভয়। তারা লোককে ঠকায় না; কথা দিয়ে কথা রাখে। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও ভাল; বিদেশের সঙ্গে ভারতের নিয়মিত ব্যবসা চলে।

বৌদ্ধধর্মের অবনতি—হিউয়েন সাঙের বই থেকে আমরা জানতে পারি, হর্ষের যুগে ভারতে হিন্দু আর বৌদ্ধ—দুই ধর্মই চলছিল, তবে বৌদ্ধদের প্রভাব ক্রমেই কমে আসছিল। এই সময় হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্মের পণ্ডিতরাই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন; বৌদ্ধেরা তখন আগেকার মত লৌকিক ভাষায় ধর্মচর্চা করতেন না। ভারতের নানা জায়গায় পাঁচ হাজার বৌদ্ধ মঠ ছিল। মঠগুলোতে অসংখ্য ভিক্ষু থাকতেন। তাঁরা ধর্ম ও বিদ্যার চর্চা নিয়ে থাকতেন।

নালন্দার কাহিনী

হিউয়েন সাঙের সময় বিহারের নালন্দায় একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তিনি নিজে এখানে কয়েক বৎসর থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। বড় বড় বৌদ্ধ আচার্য আর পণ্ডিত এখানে ছাত্রদের পড়াতেন। চীন, তাতার, পূর্ব উপদ্বীপ প্রভৃতি দূর দূর দেশ থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত। প্রায় দশ হাজার ছাত্র এখানে থাকত, পড়ত। ছাত্রদের থাকার জন্যে বিরাট একটা দালান ছিল। ছাত্রদের পড়াশোনা বা

থাকা-খাওয়ার খরচ চলত রাজা ও শ্রেষ্ঠীদের দানে। নালন্দায় অসংখ্য পুঁথি ছিল। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে এখানে একটা মানমন্দিরও ছিল।



নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

ভাষাজ্ঞানের ভিত্তি পাকা করার পর, ছাত্রদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া হত। শিল্পবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, জ্যোতিষ, দর্শন, বেদ প্রভৃতির সব রকম বিদ্যাই শেখানো হত সেখানে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া খুব শক্ত ছিল। দ্বার-পণ্ডিতের কাছে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারলে তবে ভর্তি হওয়া যেত। গুরু-শিষ্য সকলকেই কঠোর সংযমের মধ্যে থাকতে হত। শিক্ষা শেষ করতে অনেক বৎসর লাগত। হিউয়েন সাঙের সময় নালন্দার প্রধান আচার্য ছিলেন বাঙালী শীলভদ্র। হিউয়েন সাঙ শীলভদ্রের গভীর জ্ঞান ও মহান্ চরিত্রের প্রশংসা শতমুখে করে গিয়েছেন।

রাজগির পাহাড়ের কাছে বড়গাঁও বলে একটা গ্রামে মাটি খুঁড়ে সেকালের নালন্দার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

অনুশীলনী

১। হর্ষবর্ধন কি ভাবে রাজ্য পেলেন?

২। হর্ষবর্ধনের রাজ্য কত বড় ছিল? বাংলার রাজা শশাঙ্ক ও দাক্ষিণাত্যের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল?

৩। হর্ষবর্ধনের ধর্ম কি ছিল? তাঁর দান-মেলা সম্বন্ধে কি জান?

৪। হিউয়েন সাঙের ভারতকথা সংক্ষেপে লিখ।

৫। নালন্দা বিশ্ববিত্থালয় সম্বন্ধে যা জান, লিখ।

জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ

জগৎ-সভ্যতায় প্রাচীন ভারতের দান

ভারতের চারিপাশ সমুদ্র বা পর্বত দিয়ে ঘেরা, তবু বাইরের জগতের সঙ্গে স্থল ও জল উভয় পথেই ভারতের যোগাযোগ অতি প্রাচীন। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে ভারতীয় বণিকেরা মেসোপোটেমিয়া পর্যন্ত বাণিজ্য করতে যেত, সেখানে তাদের ঘাঁটি পর্যন্ত ছিল। বৌদ্ধ জাতক থেকে জানা যায় এখন থেকে কমপক্ষে দুই হাজার বৎসর আগে, ভারতীয়েরা মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও বাবিলনের বেশ খবর রাখত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভারত যে মিশরের মারফত ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য করত, তার প্রমাণ আছে। সম্ভবতঃ তার বহু আগে থেকেই চীনের সঙ্গে ভারতের যোগ ছিল।

বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ধর্ম এবং সভ্যতা বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়ের পর গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার লেনদেন হয়। সম্রাট অশোক মিশর ও গ্রীসের মত দূর দেশেও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে দূত পাঠিয়েছিলেন।

গ্রীক ও আরব—কুষাণ ও গুপ্তযুগে ভারতীয়েরা গ্রীকদের কাছে জ্যোতিষের কিছু নতুন তত্ত্ব শিখে নেয়, আর গ্রীক ও আরবরা হিন্দুদের কাছে জ্যোতিষ, গণিত আর চিকিৎসা-বিদ্যা শেখে তাদের কাছে ইউরোপের লোকে এসব বিদ্যা পেয়েছে।

খোটান—কুষাণ ও গুপ্তযুগে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম দুই-ই নতুন জীবন পায়, আর দুইয়েরই প্রচারকেরা ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সময় ভারতীয়রা মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক জায়গায় গিয়ে রীতিমত বসতি স্থাপন করে; তাদের সঙ্গে যায় ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা। মধ্য এশিয়ায়, বর্তমানে খোটানের আশে-পাশে, একাকালে ভারতীয়দের বসতি ছিল। ঐখানকার মরুভূমির মধ্যে প্রাচীন নগরের চিহ্ন দেখে খোঁড়ার ব্যবস্থা হয়। ফলে, বহু বৌদ্ধবিহার, বহু দেবদেবীর মূর্তি, দেয়ালে-আঁকা ছবি আর ভারতীয় পুঁথিপত্র বেরিয়ে পড়ে। এই সব পুঁথিপত্রের মধ্যে কুষাণ যুগের বিখ্যাত বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষের লেখা নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে এসব স্থানে ভারতীয় বসতির কথা লেখা ছিল।

চীন—আজ থেকে প্রায় ১৯০০ বৎসর আগে বৌদ্ধধর্ম চীনে যায়। মধ্য এশিয়া থেকে ব্যবসা ও ধর্মের সূত্র ধরে ভারত আর চীনের মধ্যে যাতায়াত শুরু হয়। ফা-হিয়েন বা হিউয়েন সাঙের মত অনেক চীনা বৌদ্ধ এ দেশে আসতেন ধর্ম শিক্ষা করতে, তীর্থ করতে। আবার অনেক ভারতীয়ও চীনে যেতেন বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে। কুমারজীব, গুণবর্মণ প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতরা চীনে গিয়েছিলেন ধর্ম প্রচারের জন্যে। ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র আর স-র-গ-ম—চীনে গিয়েছিল সেকালের ভারতের চিকিৎসা-বিদ্যা ও গণিত; ভারতের মূর্তিকলা স্থাপত্য ও চিত্রকলা চীনাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার

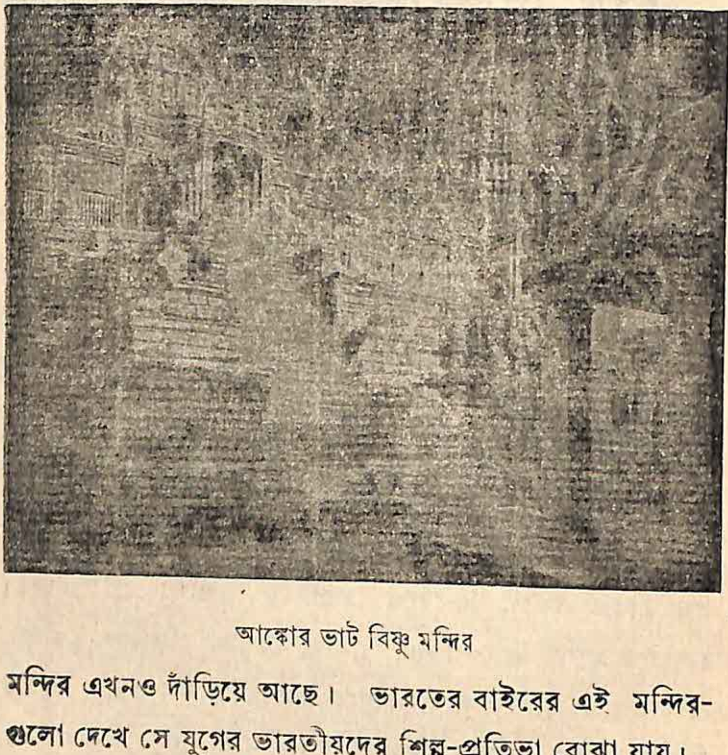
করেছিল। চীনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত বহু প্রাচীনকাল থেকেই। উভয় দেশের রাজাদের মধ্যেও যোগাযোগ ছিল। চীনের রেশমী বস্ত্র বহুকাল থেকেই আমাদের দেশে আদর পেয়ে আসছে।

জাপান—চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম জাপানে যায়। দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধপণ্ডিত বোধিসেন জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। জাপানের সম্রাট তাঁকে সেখানকার প্রধান আচার্য করে নেন।

তিব্বত—সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। তারপর থেকে তিব্বতী পণ্ডিতেরা নালন্দা ও বিক্রমশীলায় পড়তে আসেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে বাঙালী পণ্ডিত অতীশ দীপংকর তিব্বত-রাজের আমন্ত্রণে সেখানে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করতে গিয়েছিলেন। তিব্বতীরা এখনও এই বাঙালী পণ্ডিতকে প্রায় দেবতার মত সম্মান করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অনেক কালের। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকেই ঐ দিককার দু-একজন রাজার ভারতীয় নাম দেখা যায়; বোধ হয়, তারও আগে ও-দেশে ভারতীয় সভ্যতা পৌঁছেছিল। সেকালে মালয়, কাম্বোডিয়া, আনাম, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, বোর্ণিও এবং সুমাত্রা দ্বীপকে সাধারণভাবে 'সুবর্ণভূমি' বলা হত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে এসব দেশে বহু ভারতীয় বসতি গড়ে উঠেছিল। চীনা কাহিনী থেকে জানা যায়, এখানকার ইন্দোচীনে কৌণ্ডিন্য নামে এক ভারতীয় গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেন। পরে, একজন ভারতীয় হিন্দু ঐ অঞ্চলে

কম্বুজ বলে একটা রাজ্য গড়ে তোলেন। কম্বুজ-রাজ্যে সংস্কৃত ভাষার খুব চর্চা হত। কম্বুজ-রাজের রাজধানী ছিল যশোধরপুর। পরে তার নাম হয় ওঙ্কার ধাম বা আঙ্কোর থোম। প্রাচীন কম্বুজের হিন্দু রাজাদের তৈরী আঙ্কোর ভাটের শিব ও বিষ্ণুর

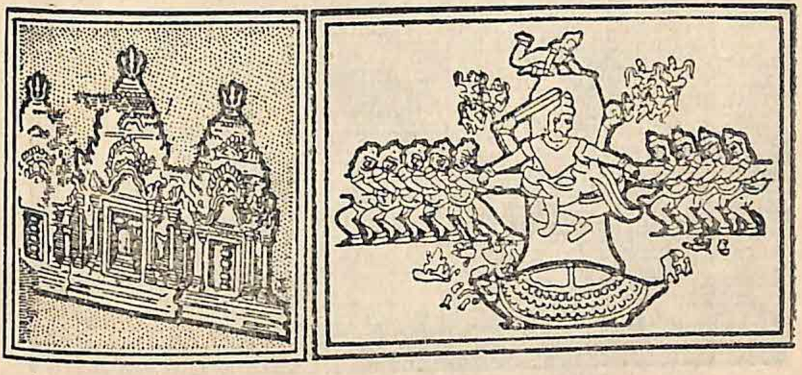


আঙ্কোর ভাট বিষ্ণু মন্দির

মন্দির এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের বাইরের এই মন্দির-গুলো দেখে সে যুগের ভারতীয়দের শিল্প-প্রতিভা বোঝা যায়।

শ্যাম—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের আগে, শ্যাম দেশে চম্পা বলে একটা রাজ্য ছিল। এখানকার রাজারা ছিলেন হিন্দু। সংস্কৃত ছিল রাজসভার ভাষা। চম্পা রাজ্যের সব শহরেই হিন্দু ও

বৌদ্ধ মন্দির ছিল বলে জানা যায়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত —অর্থাৎ ভারতে সুলতানী শাসন চলার সময় পর্যন্ত কম্বুজ, চম্পা প্রভৃতি অঞ্চল বৃহত্তর ভারতের অঙ্গ ছিল।

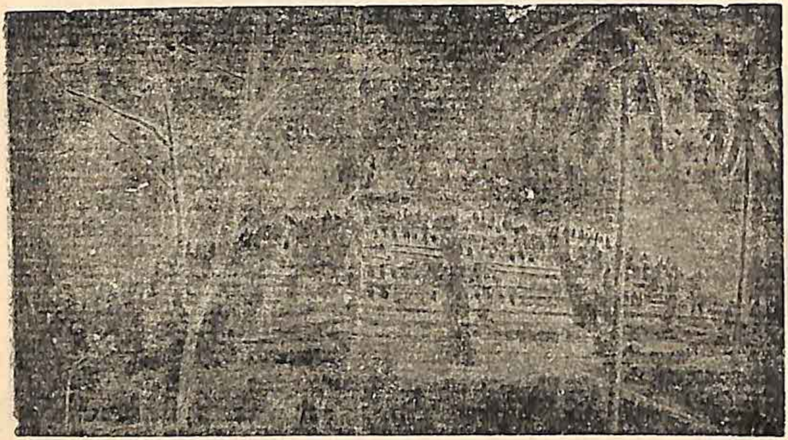


আঙ্কোর থোমে বায়ন মন্দিরের গায়ের চিত্র

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়—মালয় ও ইন্দোনেশিয়াতেও ভারতীয়রা রাজত্ব করেছিল। সেখানকার শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ; বাঙালী পণ্ডিত কুমারঘোষ ছিলেন তাঁদের গুরু। এই শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের সময় যবদ্বীপে বরবুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল। এটি একটা বিশাল, অপূর্ব সুন্দর মন্দির। ভারতেও এর মত সুন্দর মন্দির ভারতীয়রা তৈরি করতে পারেনি।

মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার লোকেরা প্রায় সকলেই এখন মুসলমান। শুধু বলিদ্বীপে এখনও হিন্দু সভ্যতা বেঁচে আছে। বলিদ্বীপের অধিবাসীরা এখনও রামায়ণ-মহাভারতের গল্প পড়ে।

মালয় বা ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম আর নাই বটে, কিন্তু ভারতের সভ্যতার ছাপ আজো সেখানে রয়ে গিয়েছে।



বরবুদুরের মন্দির

ব্রহ্ম ও সিংহল—ব্রহ্ম এবং সিংহলেও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। সিংহলের অনুরাধাপুরে এখনও তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ সে যুগে ভারত (এবং চীন) এশিয়ার দীক্ষাগুরু ছিল। ইউরোপীয়রা তাঁদের গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অনেক কিছু ভারতের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

অনুশীলনী

১। খ্রীষ্টের জন্মের আগে ভারতীয়েরা কোথায় ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন ?

২। নীচের দেশগুলির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয়দের কিরূপ সম্পর্ক ছিল ?
(ক) খোটান, (খ) জাপান, (গ) ইন্দোচীন, (ঘ) শ্যাম, (ঙ) ইন্দোনেশিয়া, (চ) সিংহল।

বাংলার পাল ও সেন রাজাদের কথা

ধর্মপাল ঃ বল্লাল সেন ঃ লক্ষ্মণ সেন

বাংলার রাজা শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনকে বশে আনতে পারেননি। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর, বাংলা দেশ কিন্তু খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। প্রায় একশ বৎসর ধরে দেশে অরাজকতা চলতে থাকে। বাংলার রাজাদের মধ্যে তখন লড়াই লেগেই থাকত। ফলে, দেশের লোক শান্তিশৃঙ্খলার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। এ হেন অবস্থায় দেশের মধ্যে যাঁরা মোড়ল ছিলেন, তাঁরা গোপাল নামে এক বীরকে নিজেদের রাজা নির্বাচন করেন। গোপাল বাংলা দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তিনি যে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তার নাম হয় পাল বংশ।

মহারাজ ধর্মপাল

পাল রাজাদের রাজ্য ছিল সারা বাংলা জুড়ে। গোপালের ছেলে ধর্মপাল রাজা হয়ে প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত জয় করেন। এক সময় কনৌজও তাঁর অধিকারে আসে। এই কনৌজ নিয়ে পশ্চিম ভারতের গুর্জর প্রতীহার বংশের আর দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজাদের সঙ্গে ধর্মপালকে অনেক কাল যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কনৌজ অধিকার করে ধর্মপাল সেখানে এক বিরাট দরবার করেন, সে সময় ভারতের অনেক রাজাই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। ধর্মপালের উপাধি হয়

'রাজচক্রবর্তী' ও 'উত্তরাপথনাথ'। দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দদেবের কাছে ধর্মপালকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল বটে, তবু উত্তর ভারতে ধর্মপালই সব চেয়ে বড় রাজা হয়ে ওঠেন। তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল পাটলিপুত্রের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনা। তিনি তা কিছুটা করতে পেরেছিলেন। তিনিই ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা।

ধর্মপালের ধর্ম—ধর্মপাল বড় বীর ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর খ্যাতি কেবল বীরত্বের জন্যে নয়; তাঁর খ্যাতি তাঁর ধর্মপ্রীতির জন্যেও। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁর যুগে বৌদ্ধধর্ম ই বাংলা দেশে প্রবল ছিল। ঐ সময় 'চর্যাপদ'গুলো রচিত হয়েছিল। বৌদ্ধ সাধুদের এই সাধন-সঙ্গীতগুলোই হল প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন।

বিক্রমশীলা বিহার : ধর্মপাল মগধে একটি বৌদ্ধ মঠ তৈরি করেন—তার নাম ছিল বিক্রমশীলা বিহার। ধর্মপালের আর এক নাম ছিল 'বিক্রমশীলদেব'। সেই জন্যে বোধ হয় বিহারটির ঐ নাম দেওয়া হয়েছিল। নালান্দার মত এখানেও দেশবিদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতরা পড়তে আসতেন। দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরাই এখানে মহাচার্য নিযুক্ত হতেন। বিখ্যাত পণ্ডিত অতীশ দীপংকর এই বিহারের মহাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি তিব্বতে গিয়ে ধর্ম প্রচার করেন। ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিহারের মত আরও কয়েকটি বিহার স্থাপন করেছিলেন।

সোমপুরী : ধর্মপালের সময়ে এখনকার রাজশাহী জিলার পাহাড়পুরে একটা প্রকাণ্ড বিহার বা বৌদ্ধ মঠ ছিল



পাহাড়পুর : কৃষ্ণকর্তৃক কেশী বধ



পাহাড়পুর বিহারের কারুকার্য



কার্তিকেয় মূর্তি



ব্রোঞ্জনির্মিত অবলোকিতেশ্বর
পদ্মপাণি মূর্তি (বিহার)

সেকালে তার নাম ছিল সোমপুরী বিহার। ধর্মপাল এই বিহারের খরচ চালাতেন। মাটি খুঁড়ে এই বিহারের ধ্বংসাবশেষ বের করা হয়েছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল এই বিহার। বিহারের মধ্যে ছিল একটু খোলা জায়গা, তবে মাঝখানে একটা মন্দির। বিহার ও মন্দিরের গায়ে বহু দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা ছিল, সেগুলি দেখলে বাংলা দেশের যে একটা বিশেষ শিল্পরীতি ছিল, তা বেশ বোঝা যায়।

সেন বংশ

পালবংশ প্রায় চার শ বৎসর রাজত্ব করেছিল। কালক্রমে পাল রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে, সেনবংশীয় রাজারা বাংলার সিংহাসনে বসেন। সেন রাজারা বাঙালী ছিলেন না; তাঁদের পূর্বপুরুষ সামন্তসেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ থেকে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মী অর্থাৎ ধর্মে হিন্দু। বিজয় সেন ছিলেন সেন বংশের প্রথম রাজা।

বল্লাল সেন

রাজ্য—বিজয় সেন পালবংশীয় শেষ রাজাকে হারিয়ে বাংলার রাজা হন। তাঁর ছেলে বল্লাল সেন মগধ ও মিথিলা জয় করে তাঁর রাজ্য আরও কিছুটা বাড়িয়েছিলেন।

পাণ্ডিত্য—বল্লাল সেন নিজে খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি 'অদ্ভুতসাগর' বলে একখানা জ্যোতিষের বই, আর 'দানসাগর' বলে একখানা স্মৃতির বই লিখেছিলেন।

সমাজ সংস্কার—বল্লাল সেন বাংলার সমাজকে নতুন করে গড়েছিলেন। এই জন্যই তাঁর খ্যাতি। তিনিই বাংলার উঁচু বর্ণের হিন্দুদের বাছাই করে, তাদের এক ভাগের নাম দেন 'কুলীন'। বংশ-গৌরব, শিক্ষা-দীক্ষা ও আচার-ব্যবহারে যাঁরা ভালো তাঁদের নাম হল কুলীন; সমাজে তাঁদের মানসম্মান বাড়িয়ে দেওয়া হয়। বল্লাল সেনের আমলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। শাস্ত্রাদি ঘেঁটেঘুটে তাঁরা মানুষের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে নানা বিধান দিতে লাগলেন। বাংলা দেশের সমাজে সে সব ক্রমে চালু হয়ে যায়।

প্রায় একুশ বৎসর রাজত্ব করার পর ছেলে লক্ষ্মণ সেনকে রাজ্যভার দিয়ে, বল্লাল সেন সস্ত্রীক সংসার ত্যাগ করে চলে যান। লোকে বলে সজ্ঞানে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন।

লক্ষ্মণ সেন

বল্লাল সেনের পর তাঁর ছেলে লক্ষ্মণ সেন বাংলার রাজা হন। তখন তাঁহার বয়স ষাট বৎসর।

রাজ্য বিস্তার—লক্ষ্মণ সেন খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। যৌবনে তিনি কাশী, কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করেন। কাশীতে, প্রয়াগে ও পুরীতে তিনি বিজয়স্তম্ভ তৈরি করিয়েছিলেন।

তুরুকদের বঙ্গ-বিজয়—লক্ষ্মণ সেনের প্রধান রাজধানী ছিল মালদহ জেলার গৌড়ে; নিজের নামানুসারে তিনি তার নাম রেখেছিলেন লক্ষ্মণাবতী। তাঁর আর এক রাজধানী ছিল

গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে। শেষে বয়সে তিনি এখানেই এসে থাকতেন। সেই সময় মুসলমানরা বাংলা আক্রমণ করে। মুসলমানদের বাংলা দেশ জয় সম্বন্ধে অনেক উদ্ভট গল্প আছে। মহম্মদ ঘোরীর এক তুরুক সেনাপতি মহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার নাকি মাত্র আঠারো জন ঘোড়সওয়ার নিয়ে নবদ্বীপ (নদীয়া) শহর দখল করেন। আর বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন নগর ছেড়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। এ গল্পটা পাওয়া যায় মিনহাজউদ্দীন শিবাজীর লেখা তুরুকদের মগধ ও বাংলা জয়ের কাহিনীতে। এ দেশের রাজাকে ছোট করে দেখাবার জন্যেই এটা কল্পিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই মিনহাজউদ্দীনই কিন্তু তাঁর কাহিনীতে লক্ষ্মণ সেনকে হিন্দুস্থানের 'খলিফা' বলেছেন ; তাঁর দান ও শাসন-নীতির খুব প্রশংসা করেছেন।

তুরুকরা প্রথম দিকে সারা বাংলার মধ্যে কেবল গৌড় ও নবদ্বীপ ছাড়া বিশেষ কোন জায়গা দখল করতে পারেনি বলে জানা যায়। লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে গিয়ে আর চার-পাঁচ বৎসর রাজত্ব করার পর আশি বৎসর বয়সে মারা যান। তিনি বাংলার শেষ হিন্দু রাজা।

লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা—লক্ষ্মণ সেন তাঁর বাবার মতই পণ্ডিত লোক ছিলেন। শোন যায়, বল্লাল সেন তাঁর 'অদ্ভুত-সাগর' বইখানা শেষ করতে পারেননি, লক্ষ্মণ সেন সেখানা শেষ করেন। লক্ষ্মণ সেন নিজেও কবি ছিলেন। তাঁর সভায় ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'-এর মত মধুর গীতাবলী সংস্কৃত ভাষায় আর

নাই। 'পবনদূত' কাব্যের কবি ধোয়ীও ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় আর এক রত্ন ছিলেন হলায়ুধ। তিনি প্রথমে ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত, পরে হন তাঁর প্রধান মন্ত্রী। সেকালে হলায়ুধের মত পণ্ডিত কেউ ছিলেন না। গোবর্ধন, শরণ, উমাপতি ধর নামে আরও তিনজন কবি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার অলঙ্কার ছিলেন।

অনুশীলনী

১। মহারাজ ধর্মপাল সম্বন্ধে যাহা জান, লিখ।

২। বিক্রমশীলা বিহার ও সোমপুরি বিহার সম্বন্ধে কি জান?

৩। অতীশ দীপংকর কে ছিলেন?

৪। বল্লাল সেন কিসের জন্য প্রসিদ্ধ? তাঁর সম্বন্ধে যাহা জান, লিখ।

৫। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় কোন্ কোন্ পণ্ডিত ছিলেন?

৬। তুরুকদের বাংলা বিজয় সম্বন্ধে কি জান?

দিল্লীর সুলতানী রাজত্ব

সুলতানা রিজিয়া ঃ আলাউদ্দীন খিলজী ঃ মহম্মদ তুঘলক

আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাত শ বৎসরের আগেকার কথা। তার আগে, এক সিন্ধু দেশ ছাড়া ভারতের কোথাও মুসলিম শাসন প্রবর্তিত হয়নি। সিন্ধু দেশে যে মুসলিমরা শাসন করত তারা ছিল জাতিতে আরব। আফগানদের মধ্যে প্রথম ভারত আক্রমণ করেন মহম্মদ ঘোরী। সে সময় দিল্লী ও কনৌজের রাজাদের মধ্যে ঝগড়া চলছিল ; সেই সুযোগে মহম্মদ ঘোরী প্রথমে দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজকে এবং তার পরে কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রকে আক্রমণ করেন। পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্র হেরে যাওয়ায় উত্তর ভারতে আফগান রাজত্বের পত্তন হয়। মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর এক সেনাপতি কুতুবউদ্দীন দিল্লীর স্বাধীন সুলতান হয়ে বসেন। তিনি যে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তাকে বলা হয় দাসবংশ। তার কারণ, কুতুব নিজে এককালে মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ছিলেন ; তাছাড়া ঐ বংশের কয়েকজন সুলতানই প্রথম জীবনে ছিলেন ক্রীতদাস।

সুলতানা রিজিয়া

কুতুবের ক্রীতদাস ও জামাই ছিলেন ইলতুৎমিশ। কুতুবের ছেলেকে সরিয়ে তিনি দিল্লীর সুলতান হন। এই ইলতুৎমিশের

কন্যা রিজিয়াও তাঁর অপদার্থ ভাইকে সরিয়ে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। রিজিয়া ছাড়া আর কোন মেয়ে কোনকালে দিল্লীর সিংহাসনে বসেননি। রিজিয়া খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি পুরুষের মত পোশাক পরে দরবারে বসে বিচার করতেন; দরকার পড়লে নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লড়াই করতেন। দরবারের তুরুক ওমরাহরা এসব পছন্দ করত না। তিনি যখন এক জন ওমরাহকে বিবাহ করলেন, অন্য ওমরাহরা তখন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহ দমন করতে না পেরে রিজিয়া ও তাঁর স্বামী তাদের হাতে মারা গেলেন। রিজিয়া মাত্র সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করেছিলেন; ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রমাণ করে যান, মেয়েরাও অতি দক্ষতার সঙ্গে দেশ শাসন করতে পারেন।



রিজিয়া

আলাউদ্দীন খিলজী

দাসবংশের শেষ সুলতান কায়কোবাদকে হত্যা করে জালালউদ্দীন খিলজী বলে একজন ওমরাহ দিল্লীর মসনদে বসেন। কিন্তু তাঁকে বেশী দিন রাজত্ব করতে হয়নি। তাঁর নিজের ভাইপো ও জামাই আলাউদ্দীন কৌশলে তাঁর মৃত্যু

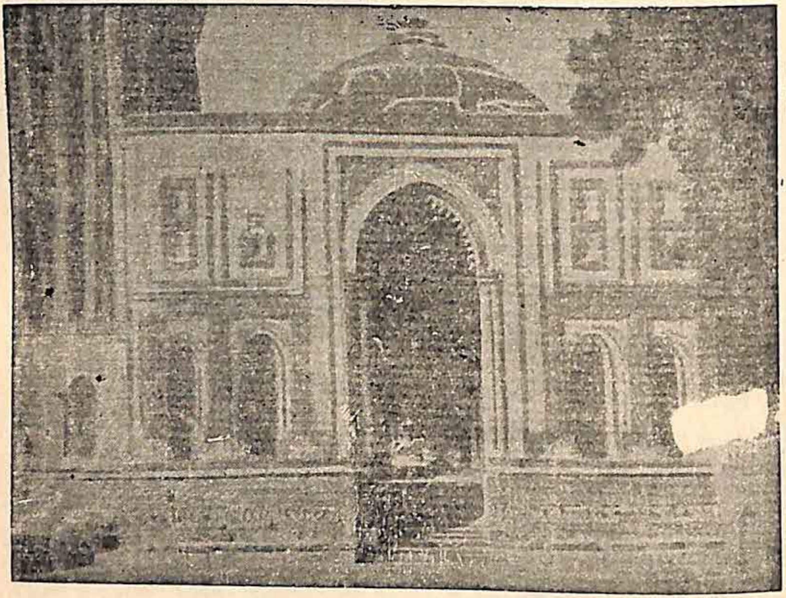
ঘটিয়ে নিজে সুলতান হয়ে বসেন। দিল্লীর সমস্ত আফগান সুলতানদের মধ্যে এই আলাউদ্দীনই ছিলেন সবচেয়ে দক্ষ আর পরাক্রমশালী।

রাজ্য-বিস্তার—সুলতান হওয়ার পর আলাউদ্দীন প্রথমে মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। মোঙ্গলরা যখন ভারত আক্রমণ করছিল। তাদের ভারত থেকে তাড়িয়ে তিনি পর পর গুজরাট, দেবগিরি, চিতোর ও মালব জয় করেন; এসব দেশের মধ্যে চিতোর কিছুদিন পরেই আবার স্বাধীন হয়ে যায়। তারপর আলাউদ্দীন তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুরকে পাঠান দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্যগুলো জয় করতে। এইভাবে দক্ষিণে মাদুরা পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়। তাঁর সময় কাশ্মীর, নেপাল ও আসাম ছাড়া, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ দিল্লীর সুলতানের কাছে মাথা নোয়ায়।

ওমরাহদের শক্তি হ্রাস—আলাউদ্দীন অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি দেখলেন, ওমরাহদের বশে রাখতে না পারলে নিরাপদে রাজত্ব করা সম্ভব নয়। তাই ওমরাহদের শক্তি খর্ব করার জন্যে তিনি জায়গির প্রথা উঠিয়ে দেন। ফলে, তাঁর রাজশক্তি খুব মজবুত হয়, আর ওমরাহদের বিদ্রোহ করার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

রাজার নিয়ন্ত্রণ—আলাউদ্দীন সুশাসক ছিলেন; তাঁর সময় দেশে শান্তি ছিল। ভারতের সর্বত্র যাতায়াত ও বাণিজ্যের সুবিধা ছিল। নিজের বিরাট সৈন্যদলের উপর নির্ভর করে তিনি রাজকার্য চালাতেন। সৈন্যরা যাতে সস্তায় জিনিস

পায়, তার জন্য তিনি বাজারের দর বেঁধে দিতেন। তাতে তাঁর সৈন্যপোষার খরচ কম হত। গুপ্তচরের সাহায্যে তিনি রাজ্যের সব খবর রাখতেন।



আলাই দরওয়াজা

তাঁর আমলে প্রজারা মোটামুটি ভালই ছিল, তবে মাঝে মাঝে তাদের উপর খাজনার চাপ একটু বেশীই পড়ত।

শিল্পপ্রীতি—সাহিত্য ও শিল্প-কলার দিকে আলাউদ্দীনের বেশ ঝোঁক ছিল। দিল্লীর আলাই দরওয়াজা ও নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগা তাঁরই সময়ে তৈরী হয়েছিল। বিখ্যাত পার্শী

ও উর্দু কবি আমীর খসরু ছিলেন তাঁর সভাসদ্। আমীর খসরু ভারতবর্ষকেই তাঁর নিজের দেশ বলে মনে করতেন; এ দেশকেই পুণ্যভূমি বলে ভালোবাসতেন।

মহম্মদ তুঘলক

খিলজী বংশের পর দিল্লীর স্থলতানী যায় তুঘলকদের হাতে। এই বংশের একজনের নাম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে—তাঁর পাগলামির জন্যে। তিনি হলেন মহম্মদ তুঘলক।

চরিত্র—মুসলমান স্থলতানদের মধ্যে মহম্মদ তুঘলকের মত প্রতিভাবান কেউ ছিলেন না। তিনি যা শিখতেন, ভুলতেন না। কোরান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। সব বিদ্যায় তিনি পাকা ছিলেন এবং চমৎকার কবিতাও লখতে পারতেন। সত্যিকারের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন তিনি। কোরানের সমস্ত নির্দেশ তিনি মেনে চলতেন, অথচ তাঁর কোন রকম গোঁড়ামি ছিল না। তিনি সাদাসিদা ভাবে জীবন কাটাতেন। তাঁর চরিত্রও খুব ভাল ছিল। তিনি বিনয়ী ও দানশীল ছিলেন। শাসক ও যোদ্ধা হিসাবেও তাঁর নাম ছিল। এত গুণ থাকলেও কিছুই কোন কাজে আসেনি। তার কারণ, তাঁর বিষয়বুদ্ধির অভাব ছিল, আর তিনি অত্যন্ত বদরাগী ও খেয়ালী ছিলেন।

স্থলতানের বদ খেয়ালের নমুনা—সিংহাসনে বসার পর, মহম্মদ তুঘলক হানাদার মোঙ্গলদের টাকা দিয়ে বশ করার চেষ্টা করেন। টাকার লোভে মোঙ্গলরা বারে বারে তাঁর রাজ্যে উৎপাত করতে থাকে, ফলে তাঁর রাজভাণ্ডার খালি হয়ে যায়।

একবার, মহম্মদ তুঘলক মধ্য এশিয়ার কোন কেল্লা জয় করার জন্যে এক বিরাট সৈন্যদল গড়লেন। অজস্র টাকা ব্যয় হল; আর শেষ পর্যন্ত টাকার অভাবে সে সৈন্যদল ভেঙে দিতে হল।

আর একবার তিনি এক বিরাট সৈন্যদল গড়ে তিব্বত জয় করতে বের হলেন। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও খাদ্যের অভাবে প্রায় সব সৈন্যই মারা পড়ল। ফলে রাজভাণ্ডার থেকে অনর্থক মোটা টাকা বেরিয়ে গেল। টাকার অভাব পূরণ করার জন্যে তিনি তামার নোট চালাবার চেষ্টা করলেন। বিদেশী বণিকরা সে নোট নিতে চাইল না। তার উপর নোট জাল হতে লাগল। নিজের ভুল বুঝে, তিনি সমস্ত নোট কিনে নেওয়ার আদেশ দিলেন। জাল নোট কিনতে কিনতে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল।

সুলতানের একবার খেয়াল হল ঃ দেবগিরিতে রাজধানী করলে সুবিধা হবে। দিল্লীর লোকদের তিনি জোর করে সেখানে নিয়ে গেলেন। কিছুকাল পরে তাঁর মনে হল দিল্লীই ভাল ছিল। তখন তিনি সকলকে আবার দিল্লী ফেরালেন।

আর একবার রাজভাণ্ডার খালি দেখে তিনি প্রজাদের খাজনা বাড়িয়ে দিলেন। প্রজারা বনে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। রাগে অন্ধ হয়ে তিনি সৈন্য দিয়ে তাদের অনেককে মেরে ফেললেন। ফলে, জমিতে চাষ হল না; দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

বদ-খেয়ালের ফল—মহম্মদ তুঘলকের এইসব বদ-খেয়ালের ফলে প্রজাদের মধ্যে স্বভাবতই অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা

দিয়েছিল। এই সব বিদ্রোহ দমন করতে তাঁকে শেষ দিকে বেশ বেগ পেতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করতে গিয়েই সিন্ধু দেশে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইব্‌ন্ বতুতা—মহম্মদ তুঘলকের সময় ইব্‌ন্ বতুতা বলে একজন আরব পণ্ডিত ভারতে আসেন। এদেশে থেকে তিনি সংস্কৃত শেখেন, এ দেশের নানা বিদ্যায় পারদর্শী হন। এ দেশের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করেন। তাঁর লেখা থেকে মহম্মদ তুঘলক সম্বন্ধে এবং তাঁর আমলের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়।

অনুশীলনী

১। স্থলতানা রিজিয়া সম্বন্ধে যাহা জান, লিখ।

২। স্থলতান আলাউদ্দীনের রাজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

৩। মহম্মদ তুঘলকের গুণ ও দোষের বিবরণ দাও। তিনি কি ভাবে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন? তাঁর শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

তুরুক আমলে সংস্কৃতি-সমন্বয়

নানক : কবির : চৈতন্য

তুরুক আমলে বাংলার সাহিত্য ও শিল্পকলা

আমাদের দেশ চিরদিন মানুষের মিলনতীর্থ। কত দেশের কত জাতির লোক এদেশে এসে আমাদের মধ্যে মিলে গিয়েছে, এদেশী হয়ে গিয়েছে।

ভারতে মুসলমান রাজত্ব শুরু হলে হিন্দু-মুসলমানে মেলামেশা হতে লাগল। ইব্‌ন্ বতুতা বলেছেন, ব্রাহ্মণেরা নিজেদের খুব বড় মনে করে ; অন্য জাতের কাছে কিছু শিখবার আছে, তা মানতে চায় না। মুসলমানদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়ে হিন্দুরা দেখল, মুসলমানদের কাছেও তাদের অনেক শিখবার আছে। ধর্মের সাম্য ও উদারতার দিকে হিন্দুদের নজর পড়ল। ফলে, একদিকে মুসলমানী প্রভাব থেকে বাঁচবার চেষ্টায় হিন্দু সমাজের বাঁধন খুব কড়া হল ; অন্য দিকে চলল মুসলমানদের ধর্ম ও সমাজের মধ্যে যা ভাল তা আত্মস্থ করার চেষ্টা।

হিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশা করে মুসলমানদেরও ধর্মমত ও আচার-বিচারে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটল। হিন্দুপ্রভাব রোধ করার জন্যে এক তুঘলক সুলতানকে আইন পর্যন্ত জারি করতে হয়েছিল। আফগান সুলতানদের আমলেই হিন্দুর বেদান্তের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে সুফী বলে একটা নূতন ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল।

মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে হিন্দুদের ধর্মমতে ও সমাজে উদারতা এল; হিন্দুদের ধর্মের গোঁড়ামি ভাঙল; সমাজে জাতিভেদের কড়াকড়ি কমে গেল। যাঁদের চেষ্টায় এটা সম্ভব হল তাঁদের মধ্যে নানক, কবীর ও বাংলার শ্রীচৈতন্যের নাম প্রথমেই করতে হয়।

নানক

নানক জন্মেছিলেন পঞ্জাবের নানকানা বলে একটা জায়গায়। তাঁর বাবার ছিল একটা মুদিখানা; নানক যখন দোকানে বসতেন, দোকানের মালপত্তর প্রায়ই সাধু ফকিরদের ডেকে ডেকে দান করে দিতেন। অল্প বয়সেই নানক ফকির হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি মুসলমানদের প্রধান তীর্থ মক্কা পর্যন্ত চলে যান। গল্প আছে,



নানক

—মক্কায় একদিন তিনি কাবা মন্দিরের দিকে পা করে শুয়ে ছিলেন। সেজন্যে এক মোল্লা তাঁকে ধমক দিলে তিনি জিজ্ঞাসা

করেন : "যেদিকে ভগবান নেই, সেই দিকটা দেখিয়ে দিতে পারেন ?" মোল্লা চুপ হয়ে যান। নানক বলতেন, ভগবানের চোখে জাত-বিচার নেই ; তিনি করেন কাজের বিচার। উপাসনার ব্যাপারে নানক জাতিভেদ মানতেন না। অনেক মুসলমানকেও তিনি শিষ্য করে নেন। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন, তাকে বলা হয় শিখ ধর্ম। নানকের উপদেশ ও বাণীই শিখদের শাস্ত্র ; শিখরা সে শাস্ত্রকে 'গ্রন্থসাহেব' বলে।

কবীর

কবীর জন্মেছিলেন কাশীর এক জোলার ঘরে। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে, এক জোলা তাকে মানুষ করে। ভগবানকে ভালোবাসা, সব মানুষকে ভালোবাসা—এই ছিল কবীরের ধর্ম। তিনি বলতেন, রাম রহিম যে-নামেই ডাকো, ভগবান এক। মনকে সাচ্চা রাখা চাই। বাইরের আচার-বিচার দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না।


কবীর

হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মের লোকই কবীরের শিষ্য হয়। তিনি মারা গেলে তাঁর হিন্দু শিষ্যরা বলেন, কবীর হিন্দু ছিলেন, হিন্দুর মত তাঁর সৎকার হোক ; মুসলমান শিষ্যরা

বলেন, কবীর মুসলমান ছিলেন, তাঁকে কবর দেওয়া হোক। সত্যি কথা এই যে, তিনি হিন্দুও ছিলেন, মুসলমানও ছিলেন; তিনি ছিলেন খাঁটি ভগবানের মানুষ। কাশী অঞ্চলের কথ্য ভাষায় তিনি যে সব গান বেঁধেছিলেন, সেগুলো থেকে তাঁর ধর্মমত বোঝা যায়; এই গানগুলিকে বলে 'কবিরের দোঁহা'। এখনও এ দেশের লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে এগুলো গেয়ে থাকে। কবীরের শিষ্যদের কবীর-পন্থী বলা হয়।

শ্রীচৈতন্য



শ্রীচৈতন্য

মধ্যযুগে এদেশে যাঁরা ধর্ম প্রচার করেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য। তাঁর জন্ম হয়েছিল বাংলার নবদ্বীপে। নবদ্বীপ তখন ছিল বাংলার বিদ্যাকেন্দ্র। শ্রীচৈতন্যের বাবা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট জেলা থেকে নদীয়ায় এসে বাস করতে থাকেন। শ্রীচৈতন্যের ছেলেবেলার নাম ছিল নিমাই। ছেলেবেলায় তিনি ভারী দুরন্ত ছিলেন। কিন্তু পড়াশোনায় তাঁর জুড়ি ছিল না। অল্প বয়সেই তিনি সমস্ত বিদ্যা শিখে ফেলেন। তাঁর সময়ে সারা ভারতে তাঁর মত পণ্ডিত কেউ ছিলেন না। কিন্তু পণ্ডিতি

তাঁর ভাল লাগত না, ভগবানের নামে তিনি পাগল হয়ে যেতেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল ; দেশে পণ্ডিত বলে খুব নামডাকও হয়েছিল ; তবুও সব ছেড়ে তিনি মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে যান। নানা জায়গায় ঘুরে তিনি ভগবানের নাম প্রচার করতে থাকেন। যে-ই তাঁকে বাধা দিতে গিয়েছে, সে-ই শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রেমে মুগ্ধ হয়েছে।

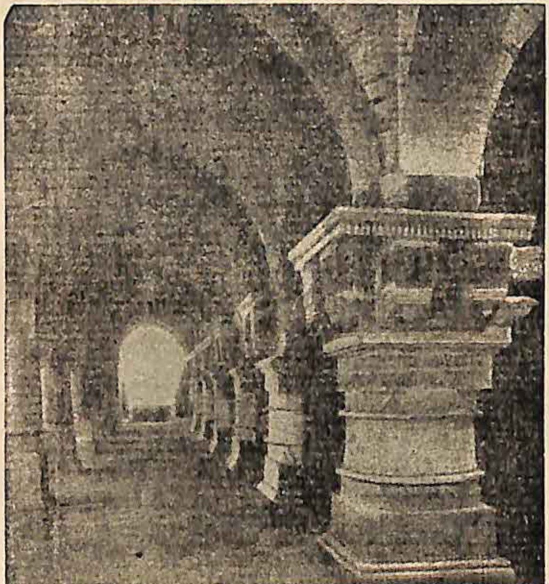
তিনি বলতেন, ভগবানকে ভালোবাসো, তাঁর নাম করো, ভগবানকে পাবে। কোন জাত-বিচার না করে সকলকেই তিনি প্রেম বিলাতেন। হরিভক্তদের মধ্যে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে কোন ভেদ মানতেন না তিনি। হরিদাস বলে এক মুসলমানও তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। তাঁর প্রচারে সারা দেশে, বিশেষ করে বাংলা ও উড়িষ্যায় একটা অপূর্ব ভাবের বন্যা ডেকেছিল। সামাজিক ও আচার-বিচারের কড়াকড়ি ভেঙে ভগবানের নামে মানুষকে মানুষ বুকে জড়াতে শিখেছিল।

প্রায় চব্বিশ বৎসর প্রেম ও সাম্যের বাণী প্রচার করে শ্রীচৈতন্য আটচল্লিশ বৎসর বয়সে পুরীধামে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীচৈতন্যের মত বাঙালী প্রাণকে নাড়া দিতে আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি। তাঁর আগেও ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্ম ছিল ; কিন্তু লোকে তাতে রস পেত না। শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মকে প্রাণবন্ত করে যান। তাঁর কাছ থেকে প্রাণ পেয়ে বাংলা দেশে যে বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তা চিরকাল বাংলার সম্পদ হয়ে থাকবে।

তুরুক আমলে বাংলার সাহিত্য ও শিল্পকলা

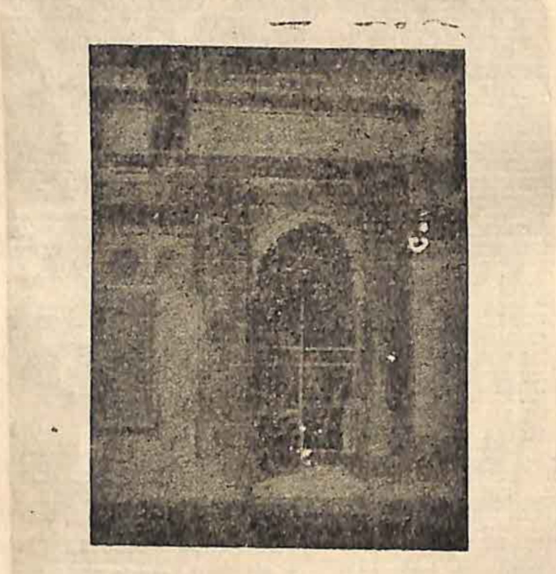
ভাষা ও সাহিত্য ঃ দেবভাষা সংস্কৃতের শিকল ভেঙে দেশের চলতি ভাষায় সাধারণ মানুষের জন্যে সাহিত্য রচনা করেন বৌদ্ধরা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও চলতি হয়



আদিনা মসজিদ

বৌদ্ধদের কৃপায়। তারপরও কিন্তু পণ্ডিতসমাজের ভাষা বা বইএর ভাষা থেকে যায় সংস্কৃতই। লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিতরা সংস্কৃতেরই চর্চা করতেন। মুসলমানরা যখন রাজা হলেন, তাঁরা

দেবভাষার ধার ধারলেন না। দেশী ভাষাকেই মর্যাদা দিলেন। বাংলার সুলতান হোসেন শাহের দেখাদেখি এখানকার হিন্দু রাজাদের সভাতেও বাংলা ভাষা স্থান পেল। বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হতে লাগল। বাংলার সুলতানদের কাছে উৎসাহ পেয়ে মালাধর বসু 'ভাগবত', পরমেশ্বর 'মহাভারত' অনুবাদ করলেন, আর বিজয়গুপ্ত রচনা করলেন তাঁর 'মনসামঙ্গল'।



ছোট সোনা মসজিদ

বাঙালী নিজের ভাষায় প্রাণের কথা বলবার সুযোগ পেল। সুলতান হোসেন শাহ্ ও তাঁর ছেলে নসরৎ শাহের উৎসাহে শ্রীচৈতন্যের আগের ও পরের বৈষ্ণব কবিদের সাধনায় এই যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অদ্ভুত উন্নতি লাভ করেছিল।

শিল্পঃ তুরুকদের সংস্পর্শে এসে বাংলার শিল্পকলাও নতুন প্রাণ পায়। সুলতানদের সময় বাংলায় অনেক মসজিদ আর সমাধিমন্দির তৈরী হয়েছিল। মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়ের সোনা মসজিদ ও কদম রসুল, আর বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ প্রভৃতি চমৎকার ইমারতগুলো এই সময়ে তৈরী হয়েছিল। মুসলমানদের মসজিদ হলেও এগুলোতে বাঙালীদেরই শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

এক কথায় বলা যায়, তুরুকদের সংস্পর্শে এসে বাংলা দেশ অনেক দিক থেকেই নতুন জীবন লাভ করে।

অনুশীলনী

১। মুসলমানরা ভারতে আসায় ভারতের ধর্মে ও সমাজে কি রকম পরিবর্তন হয়েছিল?

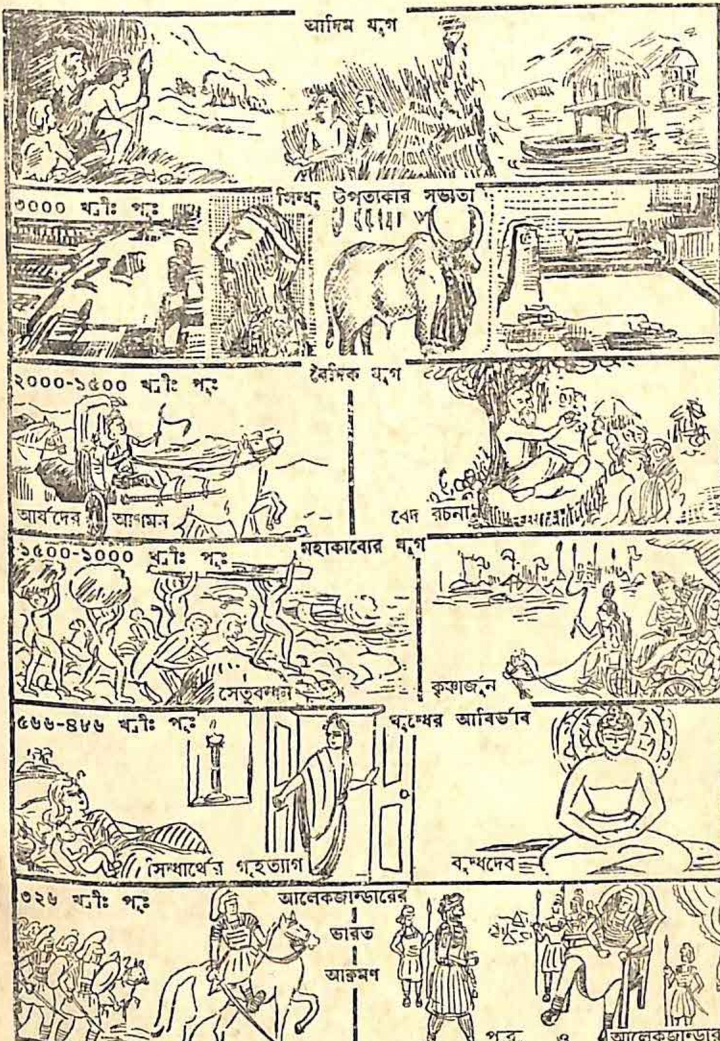
২। নানক সম্বন্ধে কি জান? তাঁর জীবন ও ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান, লিখ।

৩। কবীরের জীবন ও ধর্মমত আলোচনা কর।

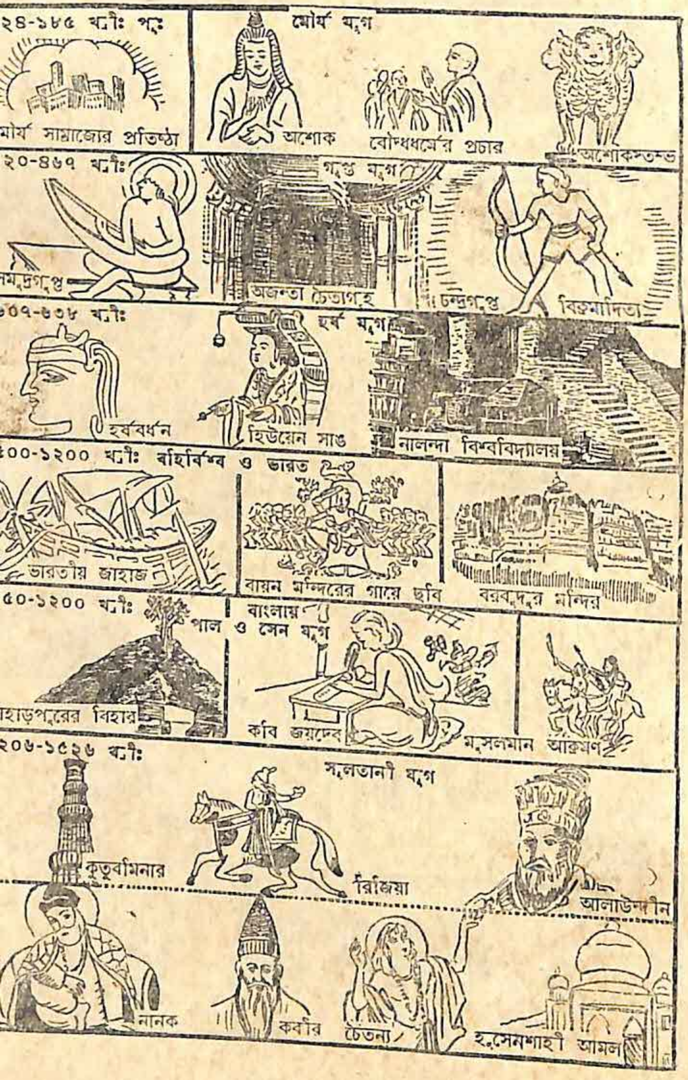
৪। শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে কি জান? বাঙালী জাতি ও বৈষ্ণব ধর্মের তিনি কি উপকার করেছিলেন?

৫। মুসলমান যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নতুন জীবন পেল কি করে? ঐ যুগের বাংলা সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে কি জান?

যুগ চিত্র


আদিম যুগ
৩০০০ খ্রীঃ পূঃ
সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা
২০০০-১৫০০ খ্রীঃ পূঃ
বৈদিক যুগ
আর্যদের আগমন
বেদ রচনা
১৫০০-১০০০ খ্রীঃ পূঃ
মহাকাব্যের যুগ
সেতুবন্ধন
কৃষ্ণার্জুন
৫৬৬-৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ
বুদ্ধের আবির্ভাব
সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ
বুদ্ধদেব
৩২৬ খ্রীঃ পূঃ
আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ
পুরু ও আলেকজান্ডার

যুগ চিত্র



২৪-১৮৫ খ্রীঃ পূঃ
মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
মৌর্য যুগ
অশোক
বৌদ্ধধর্মের প্রচার
অশোকস্তম্ভ
২০-৪৬৭ খ্রীঃ
মুদ্রগুপ্ত
গুপ্ত যুগ
অজন্তা চৈত্যগৃহ
চন্দ্রগুপ্ত
বিক্রমাদিত্য
৬০৭-৬৩৮ খ্রীঃ
হর্ষ যুগ
হর্ষবর্ধন
হিউয়েন সাঙ
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়
০০-১২০০ খ্রীঃ বহির্বিশ্ব ও ভারত
ভারতীয় জাহাজ
বায়ন মন্দিরের গায়ে ছবি
বরবুদুর মন্দির
৫০-১২০০ খ্রীঃ
বাংলায়
পাল ও সেন যুগ
াহাড়পুরের বিহার
কবি জয়দেব
মুসলমান আক্রমণ
২০৬-১৫২৬ খ্রীঃ
সুলতানী যুগ
কুতুবমিনার
রিজিয়া
আলাউদ্দীন
নানক
কবীর
চৈতন্য
হুসেনশাহী আমল